শরৎচন্দ্রের মূল্যায়ন

ভারতীয় রেনেসাঁসের মহান সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্য সৃষ্টির মূল্যায়ন করতে গিয়ে নানা সময়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ বহু বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা উপস্থাপন করেন। ঐ ধরনের ছ'টি ভাষণ থেকে নির্বাচিত অংশের একটি সংকলিত রূপ এখানে তুলে ধরা হয়েছে। ভারতীয় রেনেসাঁসের বিপ্লবী ধারার সর্বাপেক্ষা উন্নত শক্তিশালী প্রতিভূ শরৎচন্দ্রকে দেশের কোটি কোটি মানুষের হৃদয় থেকে মুছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে শাসকসম্প্রদায় ও তাদের সেবাদাসসুলভ কিছু বুদ্ধিজীবী সুপরিকল্পিতভাবে দীর্ঘদিন ধরে যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তার পরিপ্রেক্ষিতে কমরেড ঘোষের এই মূলায়ন এক অমূল্য পথনির্দেশ — যা মানুষের মধ্যে ব্যক্তি শরৎচন্দ্র, তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি ও জীবনদর্শন সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি গড়ে তুলতে সাহায্য করে। এ যুগে মানবতাবাদীদের বৃহদাংশ ভাববাদের সাথে আপসের আবর্তে যখন ঘুরপাক খাচ্ছেন, তখন শরৎচন্দ্রের সঠিক মূল্যায়ন ও স্বীকৃতির জন্য এমনই এক অনন্যসাধারণ মার্কসবাদী দার্শনিকের অন্তর্ভেদী বিশ্লেষণের প্রয়োজন ছিল।

শরৎসাহিত্য অথবা যেকোন সাহিত্যিকের চিন্তাভাবনা বা তাঁর সাহিত্য বিচার করতে গেলে, যে সময়ে বা সমাজপ্রগতির ইতিহাসের যে বিশেষ স্তরে সেই সাহিত্যিকের অভ্যুত্থান বা তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে সেই স্তরটি, সেই সময় এবং সমাজ-পরিবেশটি আমাদের মনে রাখতে হবে। স্থান-কাল নিরপেক্ষভাবে কোন সাহিত্যিকের চিন্তাভাবনা বা জীবনদর্শনের আলোচনা বা মূল্যায়ন করতে গেলে আমরা ভুল করব। কারণ, মানুষের চিন্তাভাবনা এবং ভাবজগৎ স্থান-কাল-পরিবেশের সীমার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মানুষের চিন্তা করবার যেমন অফুরন্ত এবং অশেষ শক্তি রয়েছে, মানুষের ক্ষমতার যেমন সীমা-পরিসীমা নেই, তেমনি এই 'সীমা-পরিসীমা নেই', 'অশেষ ক্ষমতা' — এই জিনিসগুলোও 'মেটিরিয়াল কন্ডিশন' (বস্তুসীমা) বা পরিবেশ, অর্থাৎ স্থান-কাল-পাত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা সীমিত। কোন মানুষের চিন্তার সীমা, তিনি যত বড় ক্ষমতাবান মানুষই হোন না কেন, একে ডিঙিয়ে যেতে পারে না। পারে না বলেই তাঁর নিজের যুগে বুদ্ধ অতবড় একজন চিন্তাশীল মানুষ হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু 'থিওরি অব্ রিলেটিভিটি' (আপেক্ষিকতাবাদ) আবিষ্কার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। অথবা আজকের দিনে আমরা সাধারণ মানুষরা পর্যন্ত আধুনিক সভ্যজগতের গণতান্ত্রিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণা, মানবতাবাদ, নারীস্বাধীনতা বা নারীর মুক্তি ইত্যাদি সম্পর্কে যে চিন্তাভাবনাকে লালনপালন করি — তদানীন্তন সময়ে বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও বুদ্ধের মতো মানুষের পক্ষে কিন্তু এইসব ধ্যানধারণার জন্ম দেওয়া সম্ভব হয়নি। এটা এই কারণে নয় যে, পরবর্তীকালে যাঁরা এইসব আবিষ্কার করেছেন বা এইসব ভাবধারাগুলির জন্ম দিয়েছেন, তাঁরা সবাই বুদ্ধ-শঙ্করাচার্য-মহম্মদ-যীশু এঁদের থেকে চিন্তাভাবনায় বা প্রতিভায় অনেক বড়। এর দ্বারা আমি যে কথাটা বোঝাতে চাইছি, তা হ'ল, সমস্ত চিন্তাভাবনা আসার আগেই সমাজ-অভ্যন্তরে মানুষের মননশীলতার বিকাশের 'ইন্‌গ্রেডিয়েন্ট' বা উপাদানগুলোর সৃষ্টি হয় বা মেটিরিয়াল কন্ডিশন-টা আগে থেকেই তৈরি হয়। অত্যন্ত জরুরি এই কথাটা অনেকেই সাহিত্যবিচার বা মনীষীদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে মনে রাখেন না। আর, মনে রাখেন না বলেই তাঁরা সব অদ্ভুত অদ্ভুত সিদ্ধান্ত করেন। প্রত্যেক মানুষ, তিনি যত বড় মানুষই হোন না কেন, তাঁর চিন্তা এবং প্রতিভা যে মেটিরিয়াল কন্ডিশন-এর সীমার দ্বারা সীমিত, তাকে তাঁর পক্ষে অতিক্রম করে যাওয়া যে সম্ভব নয় — এই কথাটা বুঝতে পারলে তবেই আমরা স্থান-কাল পরিবেশের মধ্যে মনীষীদের যথার্থ মূল্যায়ন বা বিচার করতে পারব;এবং স্থান-কাল-পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে যে মানুষটির ভাবনাধারণা, ক্রিয়াকর্মকে আমরা বিচার করছি — ঠিক সেই সময়ের সমাজ-অগ্রগতি এবং প্রগতি আন্দোলনের দৃষ্টিকোণ থেকে তা কতটা প্রগতিশীল বা প্রতিক্রিয়াশীল, অথবা তার মধ্য দিয়ে ঠিক কী জাতের ভাবনাচিন্তা, রসোপলব্ধি, সংস্কৃতির মান প্রতিফলিত হয়েছে, তা সমাজকে কতটা এগোতে সাহায্য করেছে, যদি প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে থাকে তবে তা কতটা প্রতিক্রিয়াশীল — এই প্রশ্নগুলোও তখন আমরা বিচার করতে সক্ষম হব। তা না হ'লে আমরা ধরে নিই যে, মানুষের মূল্যবোধ এবং চিন্তাভাবনার কতকগুলি মৌলিক দিক আছে — যা স্থান-কালের সীমার দ্বারা বা

মেটিরিয়াল কন্ডিশন-এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় — যা স্থান-কালের ঊর্ধ্বে, শাশ্বত। এইরকম ধারণাকে আমি অবৈজ্ঞানিক এবং ভ্রান্ত ধারণা বলে মনে করি। এ শুধু ভ্রান্ত ধারণাই নয়, অত্যন্ত ক্ষতিকারকও বটে। কারণ, এইরকম ধারণা চিন্তার অগ্রগতির ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে, সত্যকে বোঝার ক্ষেত্রে বিপত্তির সৃষ্টি করে। এই বক্তব্যকে যাঁরা অস্বীকার করবেন, আমার এই প্রশ্নের জবাব তাঁদের দিতে হবে যে, বুদ্ধের জ্ঞানবুদ্ধি আইনস্টাইনের চেয়ে কম থাকার জন্যই কি তাঁর পক্ষে 'থিওরি অব্ রিলেটিভিটি' বা 'ইলেক্ট্রোম্যাগ্নেটিক ফিল্ড' (তড়িৎ-চৌম্বকীয় ক্ষেত্র) সংক্রান্ত নানা তত্ত্ব আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি? অথবা ইউরোপের মানবতাবাদীরা, যাঁরা গণতান্ত্রিক চিন্তাচেতনার উদগাতা বা কার্ল মার্কস যিনি অধিকতর উন্নত চিন্তার অর্থে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের উদগাতা — তাঁরা কি সব বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য, সক্রেটিস-এর মত মানুষের চেয়ে অনেক বেশি প্রতিভাবান ছিলেন বলেই এগুলো করতে পেরেছেন? এই ধরনের চিন্তার সাথে আমি একেবারেই একমত নই। আমি মনে করি, বিভিন্ন যুগের চিন্তানায়করা তাঁদের নিজের নিজের যুগের শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা যুগের সীমা, স্থান-কাল-পরিবেশের সীমা অতিক্রম করতে পারেননি। একজন ব্যক্তির ক্ষমতা এবং প্রতিভা উচ্চমানের, সর্বশ্রেষ্ঠ স্তরে থাকলেও সেই সময়ে ঐ চিন্তা তাঁর মধ্যে আসা সম্ভব ছিল না। তাই আগের যুগে কোপার্নিকাস 'ন্যাচারাল সায়েন্স' (প্রকৃতিবিজ্ঞান) সম্পর্কে যে ধ্যানধারণা গড়ে তুলেছিলেন — সেই তত্ত্বের আধারের উপরেই নিউটনের মত বিজ্ঞানীর আবির্ভাব ঘটেছে। আবার 'নিউটনিয়ান মেকানিক্স'-এর জমি এবং বুনিয়াদ তৈরি হবার পরেই আইনস্টাইনের মত 'জিনিয়াস'-এর বিকাশ সম্ভব হয়েছে।

তাই সাহিত্যেও চিরন্তন বা সর্বকালের জন্য কোন চিন্তাভাবনা, রীতিনীতি ও সাংস্কৃতিক কাঠামো মানুষকে পথ দেখাতে পারে না। একটা বিশেষ স্তর বা বড়জোর কতকগুলো স্তরকে ব্যাপ্ত করে একটা বিশেষ যুগের ভাবনাধারণা মানুষকে খানিকটা দূর পর্যন্ত এগিয়ে দেয়। তারপর নতুন পরিবেশে নতুন সমস্যার সামনে পড়ে পুরনো সেই ভাবনাধারণা — যা একদিন সমাজের প্রগতি এবং অগ্রগতির ক্ষেত্রে, মানুষের উন্নতি, কল্যাণ ও বিকাশের ব্যাপারে সাহায্য করেছিল — তা অকার্যকরী হয়ে যায়, পিছিয়ে-পড়া ভাবনাচিন্তায় পর্যবসিত হয়ে যায়। সেই একই ধ্যানধারণা নতুন নতুন সমস্যার উপরে আলোকপাত করার পরিপ্রেক্ষিতে অকার্যকরী, অসম্পূর্ণ এবং অসত্য হয়ে যায়। অতীতের সর্বোচ্চ এবং সর্বোত্তম ধ্যানধারণাগুলোর শক্ত ভিতের উপরেই এই সম্পূর্ণ নতুন ভাবধারা গড়ে উঠলেও অতীতের সঙ্গে এই নতুন ভাবধারার ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার মধ্যে একটা 'ব্রেক'-ও (ছেদও) রয়েছে। নতুন পরিবেশে, মানুষের এবং সমাজের নতুন প্রয়োজনে অতীতের ভাবধারার সাথে বিরোধের মধ্য দিয়ে একটা সম্পূর্ণ নতুন 'আইডিওলজিক্যাল ক্যাটিগরি' (আদর্শগত পরিমণ্ডল) গড়ে ওঠে। এইভাবেই রুচি-সংস্কৃতিগত কাঠামো, চিন্তাভাবনা, নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সম্পর্কিত ধ্যানধারণাগুলো অতীত যুগ থেকে বারবার নিত্যনতুন রূপে পরিবর্তিত হয়ে পাল্টে গিয়েছে। ফলে, কোন সত্যই শাশ্বত বা চিরন্তন সত্য নয়। সত্যমাত্রই বিশেষ সত্য, আপেক্ষিক সত্য। এইজন্যই সত্য 'ডিসিসিভ্' — অমোঘ ও কার্যকরী, সত্য ঘটনাকে প্রভাবিত করে। চিরন্তন সত্যের ধারণা যেহেতু অবাস্তব, তাই বেশিরভাগ সময়েই তা মানুষকে কর্মক্ষেত্রে বাস্তবানুগ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে অক্ষম করে তোলে।

ফলে, শরৎসাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমরা আজকের দিনে যেসব চিন্তাভাবনা বা আদর্শকে সবচেয়ে উন্নত বলে মনে করি, ঠিক সেই কথাগুলোই শরৎচন্দ্র তাঁর সময়ে বলেছেন কি না, আর যদি না বলে থাকেন, তবে তিনি প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে গেলেন — এই ধরনের বিচার আসলে কোন বিচারই নয়। এইভাবে যাঁরা বিচার করেন, তাঁরা বুঝতে পারেন না যে, শরৎচন্দ্র তাঁর সমসাময়িককালে সাহিত্যের মাধ্যমে যে জীবনদর্শন, চিন্তাভাবনা, সংস্কৃতি ও রুচিগত মান প্রতিফলিত করেছিলেন — সেটা তখনকার দিনে আমাদের দেশের প্রগতিশীল আন্দোলন এবং বিপ্লবী আন্দোলনের পরিপূরক ছিল কি না — এটাই মূল বিচার্য বিষয়। আজকের দিনের বিপ্লবী আন্দোলন তদানীন্তনকালের বিপ্লবী আন্দোলন থেকে, আদর্শের দিক থেকে এবং প্রকৃতিগত, সংগঠনগত দিক থেকে তো পাল্টে গিয়েছেই, এমনকী বিপ্লব করার মানুষগুলো পর্যন্ত পাল্টে গিয়েছে। ফলে আজকের দিনে প্রগতি ও বিপ্লবের প্রয়োজনে যে চিন্তাভাবনাগুলো আমাদের কাছে সবচেয়ে অগ্রসর বলে মনে হচ্ছে তার মাপকাঠিতে শরৎচন্দ্রের কোন চিন্তা ততটা অগ্রসর মনে না হলেই তা প্রতিক্রিয়াশীল এবং ভ্রান্ত — একথা বলা চলে না। এইভাবে কাউকেই মূল্যায়ন করা যাবে না। তাহলে রবীন্দ্রনাথ, সেক্সপীয়র, শরৎচন্দ্র থেকে শুরু করে তলস্তয়, সক্রেটিস্, বুদ্ধ কারোরই যথার্থ মূল্যায়ন হবে না। আমরা শুধু আজ যেটাকে ঠিক বলে মনে করি তার পরিপ্রেক্ষিতে, সমস্ত অতীতটাকেই ভ্রান্ত বলে

ধরব। এর একটাই মানে দাঁড়াবে, তা হ'ল, আমরা ছিন্নমূল। ...

...তাহলে এখন বিচার্য বিষয় হ'ল, শরৎচন্দ্রের সময়টা কী ছিল? শরৎচন্দ্রের সময়টা হচ্ছে ভারতবর্ষের রেনেসাঁস আন্দোলনের সময়, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তাল জোয়ারের সময়। রাজা রামমোহন রায় থেকেই এদেশের রেনেসাঁস আন্দোলনের শুরু বলা চলে। ইউরোপের বুর্জোয়া মানবতাবাদী ধ্যানধারণা ও চিন্তাভাবনাগুলিকে ধর্মের মূল সুরটির সঙ্গে মিলিয়ে ধর্মীয় সংস্কারের পথেই তিনি এদেশে রেনেসাঁস আন্দোলনের জন্ম দেন। ফলে, এদেশের রেনেসাঁস আন্দোলন 'রিলিজিয়াস রিফর্মেশন'-এর (ধর্মীয় সংস্কারের) পথ ধরে ধীরে ধীরে এগোতে থাকে। পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগর মশাইয়ের অভ্যুত্থান রেনেসাঁস আন্দোলনে একটি অভুতপূর্ব ঘটনা এবং যতদূর মনে হয় বিদ্যাসাগর মশাই-ই প্রথম ব্যক্তি যিনি ধর্মীয় সংস্কারের পথে রেনেসাঁস আন্দোলনের মধ্যে একটা ব্রেক ঘটালেন। তিনিই প্রথম এদেশে যতদূর সম্ভব মানবতাবাদী আন্দোলনকে ইতিহাস, বিজ্ঞান ও যুক্তির শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করাতে চাইলেন। ...বিদ্যাসাগরকে এদেশের মানুষ বড় মানুষ বলে জানেন, শ্রদ্ধা করেন। কিন্তু তাঁকে বুঝেছেন কয়জন? আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষ বিদ্যাসাগর মশাইয়ের হাঁটুর উপর কাপড় পরা, মাথায় টিকি রাখা দেখে তাঁকে একজন নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ বলেই ভাবেন। একথা ঠিক, বাইরে তাঁর শাস্ত্রকারের মতো এবং নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণের মতো বেশই ছিল। কিন্তু, ভিতরে তিনি ছিলেন তদানীন্তন ভারতীয় সমাজপরিবেশে একজন খাঁটি 'হিউম্যানিস্ট'। তিনি ভারতীয় সভ্যতার সাথে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানসভ্যতার একটি যুক্তিভিত্তিক সংযোগসাধন করতে চেয়েছিলেন। তাই তাঁর বক্তব্য ছিল, ছাত্রদের ইংরেজি শেখাও, 'মিল'-এর (জে এস মিল) লজিক পড়াও। সংস্কৃত শিখিয়ে কুব্জ হয়ে যাওয়া এই জাতির মেরুদণ্ড খাড়া করা যাবে না। ... এই জাতির মেরুদণ্ড খাড়া করতে হলে বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে তাকে পরিচিত হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। আর, ইংরেজি শিখলে দেশের যুবকরা তার মাধ্যমে ইতিহাস, লজিক ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনার সাথে পরিচিত হবে, ইউরোপের বস্তুবাদী দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হবে। তাই তিনি ব্যালেন্টাইনের মতের বিরুদ্ধতা করে বলেছিলেন, আমাদের দেশের সাংখ্য ও বেদান্ত যেমন ভ্রান্ত দর্শন, তেমনি ইউরোপের বার্কলের দর্শনের মধ্য দিয়েও ঐ একই ভ্রান্ত ধারণা প্রতিফলিত। ... আমাদের দেশের মানুষকে এইসব ভ্রান্ত দর্শনের প্রভাব থেকে মুক্ত করার জন্য ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বস্তুবাদী দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হতে হবে;তবেই দেশের মানুষ বস্তুজগৎকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে সত্যোপলব্ধি করতে এবং তার উপরে মানুষের নতুন জীবনবেদ বা মূল্যবোধ খাড়া করতে সক্ষম হবে। তাই তিনি ঐসব অসার অধ্যাত্মবাদী ও ভাববাদী দর্শন ছাত্রদের পড়াবার ক্ষেত্রে বিরুদ্ধতা করেছিলেন। ... তাঁর শিক্ষা সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি বিচার করলে অতি সহজেই ধরা পড়বে যে, ধর্মীয় সংস্কারের পথে আমাদের দেশে রামমোহন রায়ের সময় থেকে যে রেনেসাঁস আন্দোলন শুরু হ'ল — বিদ্যাসাগর মশাই ছিলেন সেই ধারার মধ্যে একটি বলিষ্ঠ ছেদ, যিনি মানবতাবাদী আন্দোলনকে তদানীন্তন পরিবেশে যতদূর সম্ভব ধর্মীয় বিচার-বুদ্ধি ও প্রভাব থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। এ সত্য তাঁর সমস্ত জীবনের কার্যকলাপ, আচার-আচরণ, কথাবার্তার মধ্য দিয়েই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়।...

... বিদ্যাসাগর মশাইয়ের ভূমিকা বাদ দিলে এবং বিদ্যাসাগর মশাইয়ের যুগটা পার হয়ে এসে আমাদের দেশের রেনেসাঁস আন্দোলন পুনরায় রিলিজিয়াস রিফর্মেশন-এর পথ ধরেই এগোতে থাকল। ... ব্রাহ্মধর্মের প্রবল জোয়ার সৃষ্টি হ'ল হিন্দুসমাজকে সংস্কার করে তাকে দোষত্রুটি মুক্ত করার জন্য।... অপরদিকে হিন্দুধর্মের 'রিভাইভ্যালিজম'-এর (পুনরুজ্জীবনের) তুমুল আন্দোলন শুরু হ'ল। হিন্দুধর্মীয় ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতার ভিত্তিতেই হিন্দুসমাজকে জাতপাত ও কলুষতা থেকে মুক্ত করার জন্য হিন্দুধর্ম সংস্কারকরা এলেন এবং এই পর্বেই রামকৃষ্ণের আবির্ভাব। ... বিবেকানন্দ এই হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলনের একটি বিস্ময়কর সৃষ্টি। তিনি রেনেসাঁস আন্দোলনকে শুধু রিলিজিয়াস রিফর্মেশনের গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখলেন না। তিনি উপাসনা এবং সাধনার পরিবর্তে কর্মযোগের ওপর জোর দিলেন এবং সারা দেশে এক প্রবল জাত্যভিমান ও দেশাত্মবোধের জন্ম দিলেন। ... তিনি যে জাত্যভিমান ও দেশাত্মবোধের জন্ম দিলেন, তা দিলেন বেদান্তদর্শন ও ভারতীয় অতীত 'স্পিরিচুয়াল প্রাইড'-এর (আধ্যাত্মিক গর্বের) ভিত্তিতে। ... অনেকটা এই কারণেই পরবর্তীকালে যে দেশজোড়া তীব্র স্বাধীনতা আন্দোলন এদেশে গড়ে উঠল, তা মূলত 'হিন্দু রিলিজিয়ান-ওরিয়েন্টেড ন্যাশনালিজম' (হিন্দু ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ) থেকে গিয়েছে। ... এরপর ধীরে ধীরে দেশের অভ্যন্তরে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও স্বাধীনতা আন্দোলন যখন প্রবল আকার ধারণ করল, ঠিক সেই সময়েই বাংলার সমাজে সাহিত্যিক হিসাবে শরৎচন্দ্রের অভ্যুত্থান। রিফর্মেশনের পথে রেনেসাঁস আন্দোলনের মধ্যে

বিদ্যাসাগর মশাইয়ের ভূমিকা যেমন মানবতাবাদী আন্দোলনকে তদানীন্তন সমাজপরিবেশে যতদূর সম্ভব ধর্মীয় প্রভাব ও ধর্মীয় যুক্তিবিচার থেকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে একটা ব্রেক (ছেদ), তেমনি স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে হিন্দু রিলিজিয়ান ওরিয়েন্টেড ন্যাশনালিজম এবং ধর্মের সঙ্গে আপসমুখী জরাগ্রস্ত মানবতাবাদী চিন্তাভাবনা থেকে শরৎচন্দ্রও একটা ব্রেক। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যচিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি মূলত বস্তুতান্ত্রিক। তাঁর সাহিত্যচিন্তায় যেখানে তিনি ধারাবাহিকভাবে বস্তুতান্ত্রিক থাকতে পারেননি, সেখানে তিনি 'অ্যাগ্‌নস্টিক' (অজ্ঞেয়বাদী) থেকেছেন। কিন্তু অধ্যাত্মবাদী চিন্তাভাবনাকে কখনও প্রশ্রয় দেননি, অতিপ্রাকৃতবাদের সাথে তাঁর সাহিত্যচিন্তা ও সাহিত্যকর্মে তিনি কখনও আপস করেননি। তদানীন্তন সমাজপরিবেশে প্রগতি এবং প্রতিক্রিয়ার মাপকাঠিতে আমাদের বিচার করতে হবে যে, আমাদের দেশে সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সময় রাজনীতিগত-সংস্কৃতিগত ক্ষেত্রে আপসমুখী ও আপসহীন যে দু'টি ধারা বর্তমান ছিল, তার মধ্যে কোন্ ধারাটি আজকের দিনে সমাজ প্রগতির আন্দোলন সৃষ্টির ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে। কোন্ ধারার 'কন্‌টিনিউয়িটি'তে বা অগ্রগতির পরিণতিতে আজকের নতুন শ্রেণীচেতনা — পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবের চেতনা ও সর্বহারা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের জন্ম দেওয়া সম্ভব হতে পারে। এইদিক থেকে বিচার করলে, যে যৌবনোদ্দীপ্ত, 'সেক্যুলার' ও আপসহীন বিপ্লবাত্মক মানবতাবাদের সুর শরৎচন্দ্রের সাহিত্যচিন্তা ও মূল্যবোধগুলির মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে, একমাত্র সেই ধারার 'কন্টিনিউইটি'-তেই (পরিণতিতেই) আমাদের দেশে আজকের দিনে সর্বহারা সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে উঠতে পারে। যদিও শরৎচন্দ্রের চিন্তাভাবনা ও মূল্যবোধগুলির শক্ত ভিতের উপরেই আজকের দিনের সর্বহারা সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে উঠবে — তবু শরৎচিন্তার সঙ্গে বিরোধও তার অবশ্যম্ভাবী।...

... তাই আমি মুক্তকণ্ঠে জোর দিয়ে এ কথাটি বলব যে, আমাদের দেশে সাহিত্যের ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রই একমাত্র সাহিত্যিক, যিনি তখনকার দিনে সমাজবিপ্লবের ঝান্ডাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন, সমাজবিপ্লবের কর্তব্য সম্পন্ন করার জন্য একনিষ্ঠভাবে লড়েছেন। অন্যান্য সাহিত্যিকরা সমাজবিপ্লব সম্পর্কে বক্তৃতা করেছেন, কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে সমাজবিপ্লব আনয়নের জন্য যে জিনিসটির দরকার ছিল, তা করেননি। অর্থাৎ জনসাধারণের মধ্যে পুরনো সমাজের অকার্যকারিতা নিঃসংশয়ে মানুষকে উপলব্ধি করাবার জন্য মানুষের মনের মধ্যে দুঃখ-বেদনা, আক্ষেপ ও উন্নততর সমাজের জন্য অভাববোধ গড়ে তোলা — সাহিত্যের মাধ্যমে এই কাজগুলো তাঁরা করতে পারেননি। একমাত্র শরৎচন্দ্রই এদেশে সার্থকভাবে এই কাজগুলি করেছেন। তাই দেখা যায় যে তদানীন্তন পুরনো সমাজের কর্তাদের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি আঘাত এসেছে শরৎচন্দ্রের উপরে। গোঁড়া হিন্দুসমাজ শরৎচিন্তার বিরোধী ছিল। অথচ তৎকালীন সময়ে হিন্দুসমাজের কূপমণ্ডুকতার বিরুদ্ধে ব্রাহ্মরাও কম কথা বলেননি। কিন্তু গোঁড়া হিন্দুসমাজ তাতে ভ্রূক্ষেপও করেনি, বা তাঁদের প্রভাবান্বিত সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে অত বিষোদ্‌গারও করেনি। কারণ, তারা বুঝতে পেরেছিল যে, সমাজের মাটিটা ঐসব সাহিত্যিকরা স্পর্শ করতে পারেননি। বাংলার সমাজের মাটিকে স্পর্শ করে মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন করার জন্য যে সাহিত্য হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধে কাজ করেছে এবং তার পুরনো আচার, রীতিনীতিগুলোর বিরুদ্ধে কাজ করেছে — সে হচ্ছে শরৎসাহিত্য এবং শরৎচিন্তা। ...

* * *

... এই মানুষকে বাংলা সাহিত্যের একজন সমালোচক বলে বসলেন, 'পাকশালার সাহিত্যিক' ! আজকাল শরৎচন্দ্র সম্পর্কে এই ধরনের সমালোচনাই স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েরা পড়ছে। বিদ্যাদিগ্‌গজ না হয়ে কি তাদের উপায় আছে ! শরৎসাহিত্যের পিছনে নাকি কোন তত্ত্ব এবং সুচিন্তিত কোনও জীবনদর্শন নেই। একথা ঠিক যে, শরৎচন্দ্র তাঁর গল্প উপন্যাসে সাধারণ মানুষের বুদ্ধির অগম্য বড় বড় কথা বলেননি। তিনি মানুষের মনে রসসৃষ্টির মাধ্যমে ব্যথা-বেদনা সৃষ্টি করে বড় চিন্তা বা ভাবনা-ধারণার বিষয়বস্তুগুলোকেই গেঁথে দিতে চেয়েছেন যাতে বুদ্ধির দরজায় আশ্রয় নিতে না হয়। যাঁরা বুদ্ধি দিয়ে গ্রহণ করতে পারবেন তাঁদের জন্য তো তত্ত্বের আকারে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই-ই রয়েছে। তাহলে সাহিত্যের প্রয়োজন কী? সাহিত্যের দরকার তো এইখানেই — তত্ত্ব বিচারের মাধ্যমে যে সত্যোপলব্ধি ও উন্নত ভাবনা-ধারণাগুলো গড়ে উঠেছে, রসোত্তীর্ণ করে তাকে গল্পের মাধ্যমে নানা ডালপালায় খেলাবার জন্য এবং মানুষের মনের সূক্ষ্ম অনুভূতির মধ্যেও তার জায়গা করে দেবার জন্য। যাঁরা তেমন শিক্ষার বুনিয়াদ এবং ক্ষমতা না থাকার জন্য যুক্তি বা বুদ্ধি দিয়ে বড়

কথাগুলো গ্রহণ করতে পারেন না — রসসৃষ্টির মাধ্যমে ব্যথা-বেদনা জাগিয়ে দিয়ে তাঁদের মনেও সেটা খানিকটা গেঁথে দেওয়া। এই কাজটি করার জন্যই তো সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা। যেমন ধরুন, মানবতাবাদ একটা সময়ে 'এথিক্যাল মাদারহুড'-এর ধারণা নিয়ে এসেছে। শরৎচন্দ্র জানতেন যে, এইসব তত্ত্বকথা তো তত্ত্বের নানান বইতেই লুকিয়ে আছে — মানুষ যেগুলো পড়েও অনেক সময় আসল জিনিসটা ধরতে পারে না। তাই তিনি জীবনকে কেন্দ্র করে যে ঘাত-প্রতিঘাতের সৃষ্টি হয়, মানুষের সম্পর্কের মধ্যে যে জটিলতা গড়ে ওঠে, মানুষের মনে যে অনুভূতি এবং হৃদয়াবেগ জন্ম নেয়, তার উপরে ক্রিয়া করে সূক্ষ্ম রসের উপলব্ধি ঘটিয়ে এবং ব্যথা-বেদনা জাগিয়ে দিয়ে মানুষের মনে সেই যুগের বড় তত্ত্বগুলোকেই গেঁথে দিতে চেয়েছেন — বুদ্ধি দিয়ে পড়াশুনা করে যাঁরা বুঝতে পারবেন, তাঁরা তো পারবেনই, কিন্তু যাঁরা সেইভাবে পারেন না, জনসাধারণের সেই বিরাট অংশটা যাতে রসের মাধ্যমে বড় তত্ত্বের হদিশ পেতে পারেন। আর রসোপলব্ধির মাধ্যমে সত্যিকারের বড় জিনিসের হদিশ যদি কোন মানুষ একবার পেয়ে যায়, তবে কিছু না বুঝেও সে খানিকটা পাল্টে যাবে। মেয়েরা এথিক্যাল মাদারহুড কী, সে সম্পর্কে তত্ত্ব জানার অর্থে একটি কথাও না জেনে এথিক্যাল মাদারহুড-এর গুণাবলীর দিকে আকর্ষিত হতে থাকবেন। গল্পের মধ্য দিয়ে এই এথিক্যাল মাদারহুড-এর ধারণাকে কেন্দ্র করে যেসব চরিত্র গড়ে উঠেছে, সেই বিন্দুর দিকে তাঁদের আকর্ষণ হবে, সাথে সাথে যাদবের দিকে তাঁদের আকর্ষণ হবে, মাধবকেও তাঁরা বুঝতে চাইবেন। এইভাবে শরৎচন্দ্র ব্যথা-বেদনা জাগিয়ে দিয়ে এবং বড়কে পাওয়ার জন্য মানসিক অভাববোধ গড়ে তুলে সমস্যাটি ধরাবার চেষ্টা করেছেন। পাতার পর পাতা ব্যাখ্যা করে তাঁর লেখাকে ভারাক্রান্ত করে তুলতে চাননি। ... যেমন ধরুন, শিক্ষিত মেয়েরা, 'এথিকস্' কী, এথিক্যাল মাদারহুড কী, তার উপর হাজার বক্তৃতা শুনেও যে জিনিস আয়ত্ত করতে পারেন না — 'মেজদিদি'র হেমাঙ্গিনী, 'বিন্দুর ছেলে'র বিন্দুবাসিনী এবং 'রামের সুমতি'র নারায়ণী তা আয়ত্ত করেছে মনের সম্পদ দিয়ে। নারায়ণীর স্বামী এবং মা এর থেকে তাকে বিচ্যুত করতে পারে না, কোন হীন স্বার্থবোধই এর থেকে তাকে বিচ্যুত করতে পারে না। শরৎসাহিত্যের এই সমস্ত নারী চরিত্র রক্তের কোন সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও, যাদের তারা সন্তান হিসাবে দেখেছে, সেই সন্তানের প্রতি তারা সমস্ত দায়দায়িত্ব পালন করেছে। বিনিময়ে সত্যিকারের 'ইমপারসোনাল মাদারহুড'-এর আস্বাদটি তারা পেয়েছে। শরৎচন্দ্র যেসব দিকগুলি এইসব গল্পের মধ্য দিয়ে তুলে ধরতে চেয়েছেন, তা হ'ল, একটি মেয়ে যদি সত্যই জীবনে নৈর্ব্যক্তিক মাতৃত্বের সন্ধান পায় — তবে তার প্রকৃতি এবং রূপ-রস-গন্ধ কীরকম হয়, নিজের সন্তান এবং পরের সন্তানের মধ্যে ভেদাভেদই বা তার কাছে কীরকম দাঁড়ায় — এসবই তিনি স্তরে স্তরে দেখাতে চেষ্টা করেছেন। এগুলো কি শুধুমাত্র গল্প? গল্পগুলোর মধ্যে দিয়ে নারীর মর্যাদাবোধের যে ছবি আঁকা হয়েছে, তা সবারই ভাল লাগে। কোন মেয়েই 'মেজদিদি' পড়ে মেজদিদির বড় জায়ের চরিত্র অনুসরণ করতে চাইবে না। মেয়েরা হেমাঙ্গিনী বা নারায়ণীর মতো হতে পারুক আর নাই পারুক, এ গল্পগুলি পড়লেই তাদের নারায়ণীর মতো বা মেজদিদির মতো হওয়ার আকাঙ্ক্ষা জাগবে। এই আকাঙ্ক্ষা জাগার অর্থ কী? মেজদিদি এবং নারায়ণীর মত চারিত্রিক মান অর্জন করার জন্য ঘরের বৌ-ঝিদের মধ্যে যদি প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগে — তাঁরা এইরকম হওয়া উচিত বা একেই যদি ভাল বলে মনে করেন — তাহলে সমস্ত পরিবারের মধ্যেই নারীজাগৃতির একটি সত্যিকারের আন্দোলন ঢুকে গেল। সমালোচকরা এসব দেখতে পান না। শরৎসাহিত্যে কোন তত্ত্ব নেই বলে তাঁরা সমালোচনা করেন। আর সেই তত্ত্বের কথাগুলোই যখন শরৎচন্দ্র এমন অপূর্ব কৌশলে ঘরে ঢুকিয়ে দিলেন, তা হয়ে গেল তত্ত্ববিবর্জিত! এ এক বিচিত্র অন্তঃসারশূন্য 'ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল' মানসিকতা।...

... সাহিত্যিকের শিল্পশৈলী ও সাহিত্যচিন্তা দু'টি আলাদা জিনিস। কোন সাহিত্যিকের সাহিত্যবিচারের ক্ষেত্রে এই দু'টি দিককে এক করে ফেলে গোলমাল করা উচিত নয়। একটি তাঁর চিন্তার দিক আর একটি তাঁর রসোত্তীর্ণ হওয়ার দিক — কত উচ্চমানের রসসৃষ্টি করতে তিনি সক্ষম, কত সূক্ষ্ম রসের কারবার করতে সক্ষম। এইদিক থেকে যদি বিচার করা যায় তাহলে দেখা যাবে, শরৎসাহিত্যে এই রস নিবেদন করার প্রক্রিয়া এত সূক্ষ্ম যে মানুষ কিছু না বুঝেই শুধু তার রসগ্রহণ করতে করতেই খানিকটা পাল্টে যায়। এই ক্ষমতার দিক থেকে তদানীন্তন সাহিত্যিকদের মধ্যে শরৎচন্দ্র ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ, তাই সাহিত্যশৈলীতে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ — একথা আমি নিঃসংশয়ে বলতে পারি।

তত্ত্বের বড় বড় কথাগুলো নিয়ে গুরুগম্ভীর আলোচনা করা সাহিত্যিকের কাজ নয় — তিনি রসস্রষ্টা। এইখানেই সাহিত্যিকের যথার্থ সার্থকতা। তাই একটা কথা আমার বার বার মনে হয়েছে, যাঁরা সাহিত্যের মধ্যে

শুধু বড় কথা খুঁজতে যান এবং তারই মাপকাঠিতে সাহিত্যের মূল্য বিচার করেন, তাঁরা সাহিত্যবিচারের ক্ষেত্রে অযোগ্য পাত্র। কারণ, কতকগুলো বড় বড় কথার জন্য সাহিত্যের কদর নয়। সমাজে তার কার্যকারিতা অন্য জায়গায়। বড় বড় কথা বলার লোকের অভাব দুনিয়ায় কোনদিনই হয়নি। সাহিত্যিকদের থেকেও অনেক বড় বড় লোক সেক্ষেত্রে সমাজে আছেন। তার জন্য দার্শনিকরা রয়েছেন, অর্থনীতিবিদ্‌রা রয়েছেন, রাজনৈতিক চিন্তানায়করা রয়েছেন, বিভিন্ন শাস্ত্রের সুপণ্ডিতরা রয়েছেন। কিন্তু তাঁরা যে কাজটি পারেন না, সেই কাজটি করেন সাহিত্যিক । সেইখানে তাঁদেরও শ্রদ্ধার পাত্র হলেন সাহিত্যিক। তাঁদেরও পূজনীয় হলেন সাহিত্যিক। যে জায়গায় আমরা অক্ষম, সেই জায়গায়ই সাহিত্যিকের কার্যকারিতা। যে কথাগুলো দার্শনিকেরা, চিন্তানায়কেরা বোঝাতে চান, সাহিত্যিক সেগুলো এমনভাবে মানুষকে রসের মাধ্যমে নানান দিকে খেলিয়ে খেলিয়ে বলেন যে, মানুষ বুদ্ধির দ্বারা যদি তা না-ও গ্রহণ করতে পারে, রসগ্রহণ করতে করতে, বাক্যবিন্যাস আওড়াতে আওড়াতে, 'ডায়ালগ'গুলো আয়ত্ত করতে করতে, তাতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়ে খানিকটা তার মানসিক পরিবর্তন ঘটে যায়। কাজেই সমাজের এই মানসিক বিপ্লব, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সেই বিপ্লব আনবার জন্য সাহিত্য অত্যন্ত কার্যকরী অস্ত্র।

তাই স্বাধীনতা আন্দোলন হোক্, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হোক্ বা সমাজের আমূল পরিবর্তনই হোক্ — যা রাজনৈতিক আন্দোলনের আবহাওয়ায় আসবে তার মানসিক জমি তৈরির ক্ষেত্রেই সাহিত্যিকদের দরকার। সেইখানেই তাঁর প্রগতিশীল ভূমিকা। এইদিক থেকে বিচার করলে ভারতবর্ষে যখন রেনেসাঁস আন্দোলন এবং জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন চলছে, সমাজবিপ্লবের আন্দোলন চলছে, তখন তার পরিপূরক সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রই সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা, সকলের চেয়ে প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করেছেন।

শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে তত্ত্বের বড় বড় কথাগুলোই বলেছেন। কিন্তু বলেছেন গল্প সৃষ্টির মধ্য দিয়ে, রসের মাধ্যমে। তিনি তত্ত্বকথা লিখে কোথাও বোঝাতে চাননি — আমি এইখানে এই আলোচনা করছি, এই বক্তব্য রাখছি। সাহিত্যিক হিসাবে এইখানেই তাঁর সার্থকতা সবচাইতে বেশি।

তত্ত্ব আলোচনা আমিও হয়তো কিছু কিছু করতে পারি। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা থেকে এমন কথা কিছু কিছু বলতে পারি যা শুনলে হতবাক হতে হবে। কিন্তু আমিও সাহিত্যিকের দরবারে ধরনা দিই, ভিক্ষা মাগি। তা না হলে বড় কথা শোনার জন্য রবীন্দ্রনাথের দরজায়ও যাই না, গ্যেটের দরজায়ও যাওয়ার দরকার হয় না। আমি জানি আমার একথা শুনে হয়তো অনেকে রেগে যেতে পারেন। কিন্তু এ কথা সত্য যে, চিন্তার জন্য রবীন্দ্রনাথ বা গ্যেটের কাছে আমাদের যেতে হয় না। তাঁদের কাছে আমাদের যেতে হয় অন্য কারণে। লেনিনের মত মানুষকে যেতে হয়েছে সাহিত্যিকের দরবারে। আমাকেও যেতে হচ্ছে। সকল দেশের সর্বকালের সমস্ত চিন্তানায়কদেরই যেতে হয়। এই কারণেই যেতে হয় যে, তাঁদেরও একটা অভাববোধ আছে। সেই অভাববোধ তাঁরা সাহিত্যের রসের মাধ্যমে পূরণ করেন। আর, তা ছাড়া সমাজের মধ্যে যে চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণাগুলোকে আমরা নিয়ে যেতে চাই, আমরা যা পারি না, সাহিত্যিক রসসৃষ্টির মাধ্যমে সেই চিন্তা-ভাবনাগুলোকে সমাজের মননের মধ্যে নিয়ে যান। এইখানেই তিনি আমাদের চেয়ে বড় ক্ষমতার অধিকারী। সেইজন্য আমরা তাঁদের পূজারী, আমরা তাঁদের শ্রদ্ধা করি। তাই সর্বকালেই দেখা গেছে, বড় সাহিত্যিকরা বড় চিন্তানায়কদের মানেন। আবার বড় চিন্তানায়করা বড় সাহিত্যিকদের কদর বোঝেন, শ্রদ্ধার আসনে রাখেন। ছোট সাহিত্যিকদেরই অহম্‌বোধ আছে। তাই তাঁরা বড় চিন্তানায়কদের অস্বীকার করতে চান। কিন্তু কোন দেশের বড় সাহিত্যিক সে যুগের বড় চিন্তানায়ককে অশ্রদ্ধা করেননি। কারণ তাঁরা পরস্পর পরস্পরের প্রয়োজন বোঝেন এবং বোঝেন কোথায় কার গুরুত্ব। তাই শরৎসাহিত্যে যাঁরাই বড় বড় কথা খুঁজতে গেছেন — তাঁরাই শরৎচন্দ্রকে বুঝতে পারেননি। আর, না বুঝেই তাঁদের অনেকে তাঁকে 'পাকশালার সাহিত্যিক' আখ্যা দিয়েছেন। এঁদের প্রতি সত্যিই করুণা হয়। আবার যাঁরা শরৎচন্দ্রকে প্রশংসা করেছেন, তাঁরাও শরৎসাহিত্যের যথার্থ মর্মার্থ ও গুরুত্ব অনুভব করতে না পারার ফলে তাঁকে শুধু 'মিষ্টি গল্প লেখক', 'দরদী লেখক' বা 'কথা সাহিত্যিক' আখ্যা দিয়েছেন।

... ইউরোপীয় রেনেসাঁসের গোড়ার দিকের ইতিহাস অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে, সেই আন্দোলনের রূপ তখন মূলত ছিল সেক্যুলার, বিপ্লবাত্মক এবং যৌবনোদ্দীপ্ত। এই রেনেসাঁস আন্দোলন ধর্ম ও অধ্যাত্মবাদী চিন্তার বিরুদ্ধে আপসহীন সুরকেই প্রতিফলিত করেছে। এই রেনেসাঁস আন্দোলনের উদগাতাদের বক্তব্য ছিল — ইতিহাস, যুক্তিবিজ্ঞান এবং প্রমাণের ভিত্তিতেই সত্যানুসন্ধান করতে হবে। তাতে যদি কিছু ভুলত্রুটি থাকে

তো থাকুক। অবোধ্য, অজ্ঞেয় যদি কিছু থাকে তবে তাকে তুমিও জানতে পার না, আমিও জানতে পারি না। ফলে, তার পিছনে ছোটাছুটি করে কোনও লাভ নেই। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যচিন্তার ক্ষেত্রে ইউরোপীয় রেনেসাঁস আন্দোলনের প্রথম যুগের মানবতাবাদের আপসহীন ধারারই এ দেশে প্রতিফলন ঘটেছে। তার জন্যই শরৎচন্দ্র ঠাট্টা করে বলেছেন, "যা বুদ্ধির বাইরে তাকে বুদ্ধির বাইরে বলেই ত্যাগ করব। মুখে বলব অব্যক্ত, অবোধ্য, অজ্ঞেয়, আর কাজে কথায় তাকেই ক্রমাগত বলবার চেষ্টা, জানবার চেষ্টা কিছুতেই করব না। যিনি করবেন, তাঁকেও কোনমতে সহ্য করব না। ... যে মুখে বলছেন জানা যায় না, সেই মুখেই আবার এত কথা বলছেন যেন এইমাত্র সমস্ত স্বচক্ষে দেখে এলেন। যাকে কোনমতেই উপলব্ধি করা যায় না, তাকেই উপলব্ধি করার জন্যে পাতার পর পাতা, বইয়ের পর বই লিখে যাচ্ছেন। কেন? নির্গুণ, নিরাকার, নির্লিপ্ত, নির্বিকার এসব কেবল কথার কথা। এর কোন মানে নেই।" কারণ, কেউ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যদি ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করেন, তাহলেই তিনি ফেঁসে যাবেন।

শরৎচন্দ্রকে নানাসময়ে অনেকেই প্রশ্ন করেছিলেন, 'আপনি তো সাহিত্যিক, কিন্তু আপনার ঘরে গিয়ে দেখি যত বিজ্ঞানের বই; অঙ্কশাস্ত্র থেকে শুরু করে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি পর্যন্ত সমস্ত সাজানো রয়েছে। ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান এবং অর্থনীতি শাস্ত্রের বইতেও লাইব্রেরি ঠাসা। কই, বিশ্বের অন্যান্য সাহিত্যিকদের বই তো আপনার ঘরে দেখি না?' একবার চন্দননগরের আলোচনাসভায় মতিবাবুরাও নানা ধরনের প্রশ্ন শরৎচন্দ্রকে করেছিলেন। সেইসব প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে এক জায়গায় শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, 'আমি নিজে গল্প লিখি। গল্প পড়ি না তা নয় — তাই খুঁজে-টুঁজে বের করলে দু'চারখানা হয়তো পাওয়াও যাবে। কিন্তু আমার এসব গল্প পড়তে তেমন ভাল লাগে না।' কথাটা মতিবাবুদের শরৎচন্দ্র ঠাট্টা করেই বলেছিলেন। কিন্তু এ কথাটার দ্বারা আসলে তিনি যে কথাটা বলতে চাইলেন তা হ'ল সামাজিক সমস্যা উপলব্ধি করা এবং গল্প বলার মধ্য দিয়ে সেই সমস্যা সম্পর্কে যদি কিছু বলতে হয়, অর্থাৎ ঘটনাসংঘাত এবং চরিত্রসৃষ্টির মধ্য দিয়ে যদি সত্য উদঘাটন করতে হয় — তবে তা একজন সাহিত্যিক তো তখনই পারেন, যখন সমাজ ও মানুষকে তিনি সত্যসত্যই বুঝেছেন। আর এ সত্য বুঝতে হলে তো বিজ্ঞান না জানলে বোঝা যাবে না। তাই মানুষের কোন্ মানসিকতা কীভাবে কোন্ খাতে গড়ে উঠেছে তা জানবার জন্য বিজ্ঞানকে জানতে হবে, ইতিহাসকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করে দেখতে হবে।

তাই দেখুন, শরৎচন্দ্রের এই ধরনের বাস্তবানুগ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বলেই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বিরাটভাবে একটা বিরোধ এসে গেল। কুসংস্কার, জাতপাত এগুলোকে যেকোন যুক্তিবাদী মানুষই খারাপ জিনিস বলবেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগেও কোন বড় মানুষই জাতপাত সমর্থন করতেন না। কিন্তু শরৎচন্দ্র এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পদ্ধতি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এবং অন্য অনেকের সঙ্গেই একমত ছিলেন না। শরৎচন্দ্র জানতেন, ছোঁয়াছুঁয়ির দোষ বাঁচিয়ে চলা, জাতপাত মেনে চলা — এই যে জিনিসগুলি মানুষের মধ্যে আছে, এগুলো সংস্কার। আর কোন একটা জিনিস অভ্যাস করতে করতে যখন সমষ্টির অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায় — অর্থাৎ ঠিক হোক্, বেঠিক হোক্, মানুষ তাকে মেনে চলতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে — তখনই তা সংস্কারে পরিণত হয়। শরৎচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধ ও ছোটখাটো লেখার মধ্য দিয়ে ব্যাপারটাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। তিনি উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে, মা তাঁর যে সন্তান বিলেতে যায় তার জাতিচ্যুত হওয়ার ভয়ে কাঁদেন। সেই ছেলে ফিরে এলে তার রোগশয্যায় বসে না খেয়ে শুশ্রূষাও করেন। কিন্তু তারপরে গঙ্গাজলে স্নান করে তবেই তিনি খেতে যাবেন। চোখ দিয়ে জল পড়বে, কিন্তু তবুও তার হাতে খাবেন না। ভিত্তি যার এইরকম দৃঢ়মূল, মন থেকে সেই সংস্কারকে কি এই ধরনের যুক্তি তুলে দূর করা যাবে যে, গুরুদেব বোঝাচ্ছেন, মানুষ কি বেড়ালের থেকেও অধম যে, মিনি বেড়ালটা তোমার পাতের থেকে খেতে পারে তাতে তোমার জাত যায় না, কিন্তু একটা মানুষ — ছোট জাতের বা অন্য ধর্মের — ছুঁলেই জাত চলে যায় ? তাহলে মানুষ কি বেড়ালের থেকেও অধম? শরৎচন্দ্র দুঃখ পেয়ে এবং খানিকটা বিদ্রূপ করে রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন যে, মানুষের সমস্যায় এইসব গাছপালা, জন্তুজানোয়ার আসেই বা কেন, আর এসেই বা এগুলো কী প্রমাণ করে? "বেড়াল কেন কোলে বসে, পিঁপড়ে কেন পাতে ওঠে, এসব তর্ক তুলে মানুষের ন্যায়-অন্যায় বিচার হয় না। এসব উপমা শুনতে ভাল, দেখতেও চকচক করে, কিন্তু যাচাই করলে দাম যা ধরা পড়ে তা অকিঞ্চিৎকর।" তাই তিনি ঠাট্টা করে বলছেন, "ব্রাহ্মণীর পোষা বেড়ালটা এঁটো মুখে গিয়ে তাঁর কোলে বসে, তাতে শুচিতা নষ্ট হয় না — তিনি আপত্তি করেন না; খুব সম্ভব

করেন না। কিন্তু তাতে প্রমাণ করলে কী? বেড়ালের যুক্তিতে এ কথা তো ব্রাহ্মণীকে বলা চলে না যে, যেহেতু অতি নিকৃষ্ট জীব বেড়ালটা গিয়ে তোমার কোলে বসেছে, তুমি আপত্তি করোনি, অতএব অতি উৎকৃষ্ট জীব আমিও গিয়ে তোমার কোলে বসবো, তুমি আপত্তি করতে পারবে না।" এইরকম একটা যুক্তি হয় নাকি? যাঁরা জাতের সমস্যাটা ঠিকভাবে বোঝেন তাঁরা জানেন যে, শুধু অশ্রদ্ধার জন্য হাতে খেতে পারে না, ব্যাপারটা এইরকমও নয়। যেখানে এতটুকু অশ্রদ্ধা নেই, যেখানে হৃদয়ভরা ভালবাসা আছে — সেখানেও সংস্কারের জন্য মানুষ খেতে পারে না। 'গৃহদাহ' উপন্যাসের মধ্যে রামবাবুর চরিত্রচিত্রণের মধ্য দিয়ে তিনি সমস্যাটাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। এক মুহূর্তে এই স্নেহপ্রবণ এবং সহৃদয় মানুষটাকে কত কঠিন করে তুলল সংস্কার। অচলার প্রতি স্নেহ যখন তাঁকে ধর্মের সীমা প্রায় ছাড়িয়ে নিয়ে চলে গিয়েছিল, তখন এক মুহূর্তে সংস্কার এসে — যে মানুষটার এত বড় হৃদয়াবেগ — তাকে একটা অমানুষ করে তুলল। তাই তিনি ঐভাবে চরিত্রচিত্রণ করে, মানুষের মনে ব্যথা-বেদনা জাগিয়ে দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন যে — যে সংস্কার, যে আচার, যে জাতপাত মানা, যে রীতিনীতিগুলো মানুষকে এমন অমানুষ করে তুলে কর্তব্য করতে ভুলিয়ে দেয়, স্নেহ-মমতা ভুলিয়ে দেয়, দায়িত্ব পালন করতে দেয় না — সেগুলো পরিত্যাগ করাই শ্রেয়। তাই ব্যথা জাগিয়ে দিয়ে তিনি সেগুলোকে দূর করতে চেয়েছেন। কারণ, শরৎচন্দ্র জানতেন যে, সংস্কারের ভিত্তিমূলে আঘাত করে এর বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে না পারলে সমাজকে এর বিষময় প্রভাব থেকে মুক্ত করা যাবে না। তাই তিনি একটা সময়ে দুঃখ করে বলেছিলেন, বিদ্যাসাগরের মতো মানুষ সমাজে বিধবাবিবাহের প্রচলন করতে চাইলেন। আইনের সহায়তা নিয়ে সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে জোর করে তিনি এ জিনিস চালু করতে চাইলেন। আইনের সহায়তা নিয়ে সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে জোর করে কিছু সংখ্যক বিধবার বিয়েও দিলেন, কিন্তু সমাজ থেকে ঐ প্রথাকে হটাতে পারলেন না। কারণ, সামাজিক আন্দোলন হিসাবে তা রূপ নিতে পারেনি। যদি পারতো — তবে সার্থক হত। আইন প্রণয়ন হওয়া সত্ত্বেও বৈধব্যপ্রথা সংস্কারের মধ্যে জট হয়ে থেকেই গেল। তদানীন্তন সময়ের সাহিত্যিকরা যদি মানুষের মনে ব্যথা-বেদনা জাগিয়ে মানুষের মানসিক গুণকেই পাল্টে দিতে পারতেন, বিধবাবিবাহের কেন প্রয়োজন — মানুষকে তা বোঝাতে পারতেন, তাহলে হয়তো বিধবাবিবাহের প্রচলনের পক্ষে একটা সামাজিক মতামত তৈরি হতে পারতো। শুধুমাত্র প্রবন্ধ লিখে বা বক্তৃতা দিয়ে প্রয়োজনীয়তা বোঝানো নয়, বিধবাদের জীবন সুন্দরভাবে পরিস্ফুট করে তুলে মানুষের মনের মধ্যে ব্যথা-বেদনা জাগিয়ে চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো — যেমন করে শরৎচন্দ্র রমা এবং রমেশকে অঙ্কন করেছেন।...

... একদল সমালোচক বলে থাকেন, শরৎচন্দ্র বিধবাবিবাহকে সমর্থন করেননি। কারণ, শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে বিধবাদের বিয়ে দেননি। সাবিত্রী বিধবা — তাকে বিয়ে দেননি, রমা বিধবা — তাকেও বিয়ে দেননি। ফলে, একথা তো পরিষ্কার বোঝাই যায় যে, বিধবাদের বিয়ে দিতে তাঁর কুসংস্কারে বেধেছে। আমি মনে করি যাঁরা এই ধরনের সমালোচনা করেন, তাঁরা সাহিত্য আলোচনার অযোগ্য। শরৎচন্দ্র জানতেন যে, তদানীন্তন সমাজপরিবেশে রমেশ-রমার বিয়ে দিতে হলে তাদের হোটেলে নিয়ে ওঠাতে হ'ত, অথবা হিন্দী সিনেমার নায়ক-নায়িকার মতো করে দিতে হ'ত। আর তা না হলে শরৎচন্দ্রের উপলব্ধিই সঠিক — সেই গ্রামীণ সমাজপরিবেশের মধ্যে রমা-রমেশের বিবাহ শ্রদ্ধার আসন পাবে না। আর সমাজে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত হতে না পারলে পরস্পরের ভালবাসা শুধু নিজের জোরেই তার সৌন্দর্য এবং মাধুর্য বজায় রাখতে পারে না। তাই তিনি রমাকে বিধবা সাজিয়েছেন এবং এটাও দেখিয়েছেন যে তার চারিত্রিক সৌন্দর্যের তুলনা নেই। রমেশের সঙ্গে তার সত্যিকারের একটা সুন্দর সম্পর্ক গড়ে তুলে তিনি দেখাতে চেয়েছেন — দেখ তো, রমা বিধবা হওয়া সত্ত্বেও এই যে দুজনের সম্পর্কটা আমি এঁকে দিয়েছি এবং এদের দু'জনের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে যে মাধুর্য ও সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে — তা কি কিছু কটু দেখাচ্ছে? তোমরা যারা ঘরে ঘরে নথওয়ালা বউ নিয়ে ঘর করছ এবং প্রেম করছ. একি সেই জাতের জিনিস? নাকি, এটা একটা অত্যন্ত বড়দরের জিনিস? রমেশ-রমার এই কাহিনী কি মনের মধ্যে ব্যথা জাগায়? এদের জীবনকে কেন্দ্র করে যে সম্পর্কটা গড়ে উঠল তারই পরিণতিতে এদের মিলন ঘটুক, তা কি তোমরা চাও ? যদি চাও তবে মর্যাদার সঙ্গে এদের জীবনকে রূপায়িত করতে হলে এই পুরনো হিন্দু সমাজটাকে ভেঙে ফেলতে হবে। ...

... 'চরিত্রহীন'-এর সাবিত্রীর চরিত্রের মধ্য দিয়ে তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে, সাবিত্রী সমাজের প্রচলিত মনন, সমাজের যে ধর্মীয় কুসংস্কার এবং ধর্মভিত্তিক নৈতিকতা — তার বিচারে একটা কুলটা, একটা বাড়ির

নীচ চরিত্রের দাসী মাত্র। সরোজিনীর মতো একটা শিক্ষিতা ভদ্রঘরের মেয়ের কাছেও যে লোভনীয় পাত্র, সেই সতীশ তাকে কী করে ভালবাসতে পারে? সতীশের সঙ্গে তার যদি কোন সম্পর্ক হয়ও তবে সেটা একটা ক্লীব সম্পর্ক হতে পারে, অথবা একটা নিম্নস্তরের যৌন সম্পর্ক হতে পরে। শরৎচন্দ্র অতি সাধারণ এই ধরনের একটা মেয়েকে নিয়ে এসে সতীশের সঙ্গে রসিয়ে রসিয়ে সংলাপের মাধ্যমে অতি সতর্কতার সঙ্গে সমস্ত নিম্নবৃত্তি থেকে তাদের রক্ষা করে সম্পর্কটাকে সত্যিকারের আকর্ষণীয় করে তুলে একটা সৌন্দর্য সৃষ্টি করলেন এবং সমস্ত ধর্মান্ধ পাঠকসমাজ, ঘরের বৌ-ঝি এবং শিক্ষিত-অশিক্ষিত লোকের সামনে ফেলে দিয়ে বলতে চাইলেন — দেখ তো এটা খারাপ কি না? এই সম্পর্কটা দেখতে কী রকম লাগছে? পড়তে মনে ব্যথা লাগে? সাবিত্রীর জন্য কি তোমরা দুঃখ অনুভব কর? সতীশ-সাবিত্রী মিলতে না পারলে তোমাদের মনের মধ্যে কি বেদনা এবং ক্ষোভ জাগে? সবাই একবাক্যে উত্তর দেবে, 'হ্যাঁ জাগে। আমরা চাই ওদের যদি একটা মিলন হত'। শরৎচন্দ্র বলতে চাইলেন, তোমরা চাওয়া সত্ত্বেও ওদের মিলন হতে পারে না, যতক্ষণ হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সমাজটি আছে। শরৎচন্দ্র তাঁর এইসব লেখাগুলোর মধ্য দিয়ে পাঠকমনে একটা অভাববোধ ও ব্যথা-বেদনা জাগিয়ে দিয়ে সমাজ অভ্যন্তরে সমাজবিপ্লবের প্রবল আকাঙক্ষা জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন, সমাজবিপ্লব সম্পর্কে কতকগুলো উপর উপর ফাঁপা ফাঁপা কথা আওড়ে নিজেকে এবং অপরকে বিভ্রান্ত করতে চাননি।

... 'চরিত্রহীন' বইখানিতে কিরণময়ী চরিত্র শরৎচন্দ্রের আর একটি বিস্ময়কর সৃষ্টি। অপূর্ব দক্ষতার সাথে কিরণময়ী চরিত্রচিত্রণের মাধ্যমে তিনি শিক্ষিত পাঠকসমাজের কাছে যেন বলতে চাইলেন, ভেবে দেখ তো নারী যদি এমন হয়, তবে তোমাদের কেমন লাগে? নিজেদের ঘরের নথ-পরা মেয়েদের বা প্রেমিকাদের সাথে মিলিয়ে দেখ তো পছন্দ হয় কি না? কিন্তু কিরণময়ীর মত জ্ঞানে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, পাণ্ডিত্যে, ঔদার্যে ও সৌন্দর্যে এমন উন্নত একটি নারীর ভবিষ্যৎ কী তোমাদের এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু সমাজে? এই সমাজে উন্মাদ হওয়া ছাড়া তার আর কোন উপায় আছে কি? এমন উন্নত ধরনের রুচি-সংস্কৃতি ও নারীত্বের অধিকারিণী হয়ে সে তো আর পাঁচটা অতি সাধারণ মেয়ের মতো যেমন-তেমনভাবে অথবা অধঃপতিত হয়ে জীবনযাপন করতে পারে না।...

এই কিরণময়ী দিবাকরের সঙ্গে জাহাজে এক বিছানায় রাত কাটিয়েছে, অথচ তার দেহ দেয়নি — এই ঘটনাকে উল্লেখ করে অনেক সমালোচক বলে থাকেন, এইখানেই নাকি শরৎচন্দ্র হিন্দুধর্মের সংস্কার মেনে চলেছেন। অথচ মতিবাবুদের সঙ্গে আলোচনায় শরৎচন্দ্র নিজেই, কেন কিরণময়ীর মতো মেয়ে দিবাকরকে দেহ দিতে পারে না, তার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। চন্দননগরের আলোচনা সভায় মতিবাবুরা শরৎচন্দ্রকে ঠাট্টা করে বলেছিলেন যে, আপনি লেখার ক্ষেত্রে যত বড় কথাই বলুন না কেন, আসলে আপনি হিন্দুধর্মের নারীর যে সতীত্ব তাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখেন। তাই কিরণময়ীর দেহ আপনি নষ্ট হতে দেননি। শরৎচন্দ্র হেসেই অস্থির। বললেন, আপনারা ঐ চরিত্রটার কিছুই বোঝেননি। আপনাদের হিন্দুধর্মের সতীত্ব থাকল কি গেল, ঐ চরিত্রটা সৃষ্টি করার সময় আমি এসব কিছুই ভাবিনি। কিরণময়ীর চরিত্র আমি অতি যত্নে সৃষ্টি করেছি। 'চরিত্রহীন' বইয়ে সরোজিনীকে দেখা গিয়েছে শিক্ষিত পরিবেশে শিক্ষিত মেয়ে। সুরবালাকেও সবাই দেখেছে, উপেনের মতো স্বামীও যার ভালবাসার রসে একেবারে মগ্ন হয়ে আছে। ঐ একই বইয়ের ভিতরে সাবিত্রীর চরিত্র কী অপূর্ব রস এবং মাধুর্যে পরিপূর্ণ। এই চরিত্রগুলো না থাকলে কিরণময়ীকে আঁকা অতো কঠিন হতো না। এরই পাশে কিরণময়ীকে সৃষ্টি করার জন্য অনেক কষ্ট করতে হয়েছে এবং কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। ফলে, যাকে এমন যত্নে এমন সুন্দরভাবে তৈরি করা হয়েছে, দিবাকরের মতো একটা ছেলেমানুষের কাছে দেহ দিলে সেই চরিত্রটাই মাটি হয়ে যেত। কিরণময়ী এমন একটি নারী চরিত্র — যার বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান এবং রুচির তুলনায় দিবাকর নিতান্ত ছেলেমানুষ। অমন ব্যক্তিত্বশালিনী, গুণবতী এবং চরিত্রবতী যে নারী — সে কি দিবাকরের মতো একটা খোকার কাছে দেহদান করতে পারে? যদিও কিরণময়ী নিজেই উপেন্দ্র'র ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার তীব্র স্পৃহা থেকে দিবাকরকে ঘরের বাইরে নিয়ে এসেছিল। কারণ, সে জানত, দিবাকর উপেন্দ্র'র অত্যন্ত প্রিয় পাত্র। কাজেই সে ঐরকমভাবে উপেন্দ্রকে পাল্টা আঘাত দিতে চাইল। কিন্তু শেষপর্যন্ত সে বুঝতে পারলো, উপেন্দ্র যতটা না আঘাত পেয়েছে, সে নিজেই আহত হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি। ভুল সে করেছে, কিন্তু তবুও তো সে একজন অত্যন্ত রুচিসম্পন্না নারী। তাই নিজের সঙ্গে নিজেকেই জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাকে লড়াই করে যেতে হ'ল। ছলনা করে দিবাকরের মধ্যে সে যে কাম উত্তেজনা এবং আকর্ষণ সৃষ্টি করল শুধু উপেন্দ্র'র ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য — সেই দিবাকরের কাছ থেকেই নারীত্বের মর্যাদা

রক্ষা করতে গিয়ে সে হ'ল ক্ষতবিক্ষত। কিন্তু নারীত্বকে সে নামাতে পারেনি। তাই শরৎচন্দ্র ঠাট্টা করে বলেছেন, নারীর সতীত্ব থাকল কি গেল, এতে তাঁর মোটেই ভ্রূক্ষেপ ছিল না। শরৎচন্দ্রের একমাত্র ভাবনা ছিল, এমন যত্নে গড়া নারীত্বের অধিকারিণী কিরণময়ীর চরিত্রটাই তাহলে মাটি হয়ে যেত।...

... শরৎচন্দ্র রমা, কিরণময়ী, সাবিত্রী এইসব চরিত্রগুলি উপস্থাপনা করে রসের মধ্য দিয়ে পাঠকমনে বেদনা জাগিয়ে সমাজমানসিকতায় যে কুসংস্কার, যে অন্ধ কূপমণ্ডুকতা রয়েছে, তাকেই ভাঙতে চেয়েছেন। প্রশ্ন জাগাতে চেয়েছেন, তোমরা কিরণময়ীর মতো এমন মেয়ে চাও কি? এমন শিক্ষায়-দীক্ষায় গুণবতী মেয়ে চাও কি? যদি চাও তবে এই সমাজে তাকে লালন-পালন করবে কী করে? তোমরা যেসব মেয়েদের নিয়ে ঘর কর তাদের মতো, না সাবিত্রীর মতো ভাষায় তোমাদের সঙ্গে কথা বলে তেমন মেয়ে চাও? যদি চাও, তাহলে সে মেয়ে এই সমাজে জন্মগ্রহণ করলেও তাকে তোমরা ধরে রাখবে কী দিয়ে? হয় তোমরা নথওয়ালা বউ নিয়ে ঘর কর, হিন্দুধর্মের আচার-বিচার কর, আর তা না হলে সমাজটাকে ভাঙো। নারীর শিক্ষা, স্বাধীনতার বিকাশ, মর্যাদাবোধের বৃদ্ধি এবং চারিত্রিক উন্নতি তো পুরুষের নিজের প্রয়োজনেই সবচেয়ে বেশি দরকার। কিন্তু মূর্খ পুরুষরা হীনতার দ্বারা পরিচালিত হয়ে নিজের কথাটাও বোঝে না। বোঝে না বলেই সংস্কারের বশবর্তী হয়ে বাইরে নারীপ্রগতি আন্দোলনের বিরোধিতা করে। আবার, অন্যদিকে শিক্ষিত মানুষ সুযোগ পেলেই নারীপ্রগতি সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়ে আসর সরগরম করে, অথচ নিজের স্ত্রীকে বাড়িতে আড়াল করে রাখে — এই তার মধ্যে অদ্ভুত দ্বন্দ্ব। তাই শরৎচন্দ্র বলছেন, পুরুষের নিজের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য, স্বাধীনতা ও রুচির বিকাশের জন্যই নারীর স্বাধীনতা, শিক্ষা-দীক্ষার উন্নতি ও নারীত্বের বিকাশ দরকার। নারীর নিজের প্রয়োজনের কথাটা না হয় বাদই দিলাম। এই হ'ল তাঁর বাচনভঙ্গি এবং এইভাবেই বিষয়গুলোকে তিনি তুলে ধরতে চেয়েছেন।...

... রমা, কিরণময়ী, সাবিত্রী, রাজলক্ষ্মী এদের পরিণতির কথা স্মরণ করে অনেকে বলে থাকেন — শরৎসাহিত্যে দৈহিক প্রয়োজনকে অস্বীকার করা হয়েছে। শরৎচন্দ্র নাকি মূলত 'সম্ভোগ বিরোধী' এবং 'নীতিবাগীশ'। এই অত্যাধুনিক সমালোচকরা শরৎচন্দ্রকে বলেছেন, নীতিবাগীশ। আবার, তখনকার দিনের নীতিবাগীশ গোঁড়া হিন্দু সমাজ তাঁকে বলত ব্যভিচারী। এই দুই দলই খুব প্রাজ্ঞ! স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় বাংলাদেশে যখন পেটিবুর্জোয়া বিপ্লববাদের প্রবল প্রভাব বর্তমান ছিল তখন শরৎচন্দ্র আমাদের মনকে ছেয়ে ছিলেন। তখন আমরা শরৎসাহিত্য সত্যিই অনুরাগের সঙ্গে পড়েছি। এখনও সময় পেলেই ফাঁকে ফাঁকে কিছু পড়ার চেষ্টা করি, তাই সংলাপগুলো আজও মনে গাঁথা হয়ে আছে। 'শ্রীকান্ত' চতুর্থ পর্বে রাজলক্ষ্মী এক জায়গায় শ্রীকান্তকে বলছে, "তোমাকে কি বিনামূল্যে অমনি অমনিই নেব — তার ঋণ পরিশোধ করব না? আর আমিও যে তোমার জীবনে সত্যি করে এসেছিলুম, যাওয়ার আগে সেই আসার চিহ্ন রেখে যাব না? এমনি নিষ্ফলা চলে যাব? কিছুতেই তা আমি হতে দেবনা।" একথা শুনে শ্রীকান্তের মন শ্রদ্ধায়, স্নেহে আপ্লুত হয়ে উঠল। এই কথার মধ্যে কী ইঙ্গিত লুক্কায়িত আছে? সেই ইঙ্গিত কাদের জন্যে লুক্কায়িত আছে? পাকশালার লোকদের জন্য? না বিদ্বজ্জনের জন্য? আর এ কেমনতর বিদ্বজ্জন, যাঁরা এই কথার পিছনে কী ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে, কেমন শিল্পসম্মত উঁচুমানের পর্দায় তাকে বলা হ'ল তা ধরতে পারেন না? এই প্রকাশভঙ্গিমা উঁচুদরের রসিক লোক না হলে ধরতে পারবেন না। দেহকে কে এখানে অস্বীকার করেছে? এই বইয়ের অন্যত্র রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে বলছে, "কাল কথা কইতে কইতে তুমি ঘুমিয়ে পড়লে, আমার গলার ওপর থেকে তোমার হাতখানি সরিয়ে রেখে আমি উঠে বসলুম। ... ভোর হলে উঠে এলুম। ভাগ্যে কুম্ভকর্ণের নিদ্রা অল্পে ভাঙে না, নইলে লোভের বসে তোমাকে জাগিয়ে ফেলেছিলুম আর কি!" — বলেই ইতি। শরৎচন্দ্র নিজেই বলেছেন, শুধু লিখতে পারাই সাহিত্যক্ষমতা নয়। সময়মত লেখনী সংযত করা বা থামতে পারাও সাহিত্যিকের একটা ধর্ম ও ক্ষমতা। ঠিক কোন্ জায়গায় থামলে তবে তা আরও রসঘন হবে এবং উঁচুমানের রসসৃষ্টি করতে সাহায্য করবে, সেটা বোঝা দরকার। নিচুমানের রসিক লোকেদের কাছে তো রাজলক্ষ্মী কী করল তা নেড়ে চেড়ে বলে না দিলে আর রসগ্রাহী হবে না। অথচ সত্যিকারের রসগ্রাহীদের তা পড়তে গিয়ে মাথায় চুল একেবারে খাড়া হয়ে যাবে। তাদের কাছে এ বিপজ্জনক ব্যাপার। শরৎচন্দ্র উন্নত রুচিসম্মত সূক্ষ্ম রসের কারবার করেছেন, স্থূল রসের কারবার করেননি।

...শরৎচন্দ্রের একটা ছোট এবং সাধারণ গল্প 'বৈকুণ্ঠের উইল'। ইন্‌টেলেক্‌চুয়ালদের মতে এটা কেবলমাত্র একটা গল্পই, তার মধ্যে ভাবনাচিন্তার খোরাক তেমন কিছু নেই! তা সত্ত্বেও আমার অন্তত বইখানা পড়তে

গেলেই দারুণ বিপত্তির সামনে পড়তে হয়। যদি খুব তন্ময় হয়ে পড়ি তবে কোন মতেই আমি আবেগকে সংযত করতে পারি না। কারণ, বইটার ভিতরে লুকিয়ে আছে একটা হারানো জিনিস, যা আমরা আজও চাইছি, কিন্তু পাই না। পুরনো দিনের ভ্রাতৃত্বের একটা সত্যিকারের মাধুর্যময় ছবি ঐ বইখানিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে তখনকার সামাজিক অবস্থায় বহু দোষের দিক ছিল ঠিক কথা, কিন্তু গুণের দিকও ছিল। সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতিকে ভিত্তি করে আমাদের দেশে তখনকার দিনে যে একান্নবর্তী পরিবারগুলি ছিল — সেই পরিবারগুলির মধ্যে ভাইয়ে ভাইয়ে এবং ভাই-বোনে ছিল মধুর সম্পর্ক। সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি ভেঙেছে, একান্নবর্তী পরিবারগুলিও ভেঙেছে — তার জায়গায় ব্যক্তিগত পরিবার এসে গিয়েছে। এগুলো প্রগতির ধারাতেই এসেছে। কিন্তু, ঐ একান্নভুক্ত পরিবারের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে কেন্দ্র করে যে সুন্দর মধু উপচে পড়েছিল, তার রস আজও পরিবেশন করলে আমরা চেখে চেখে খাই। গোকুলকে দেখে কেবলই মনে হয়, হোক্ অজ্ঞ এবং অশিক্ষিত, আমাদেরও যদি অমন একটা ভাই থাকত।

গোকুলের চরিত্রচিত্রণের মধ্য দিয়ে শরৎচন্দ্র আর একটি যে বড় জিনিস দেখাতে চেয়েছেন, তা হ'ল কেবলমাত্র পুঁথিগত বিদ্যা বা উচ্চ ডিগ্রি থাকলেই সংস্কৃতির সত্যিকারের খবর এবং আসল সুরটি আয়ত্ত করা যায় না। গোকুলের ছোট ভাই বিনোদ বি এ-তে ফার্স্ট ক্লাস — সোনার মেডেল পেয়েছে, যার জন্য গোকুল নিজেও গৌরবান্বিত — সেই বিনোদ কি সত্যিকারের সংস্কৃতির কোন খবর রাখে? সে তার নিজের মাকেও কি যথার্থ সম্মান দিতে জানে? সে বাইরের আচরণে লোকদেখানো ভদ্রতা ও শালীনতা বজায় রাখতে শিখেছে মাত্র। সংস্কৃতির আসল খবর সে কতটুকু রাখে? আর, গোকুল শিক্ষার অভাবে আবোল-তাবোল বলে, কিন্তু সত্যিকারের সম্ভ্রমবোধ ও সংস্কৃতির যেটি আসল দিক, তা সে অশিক্ষিত হয়েও কিন্তু আয়ত্ত করতে পেরেছে। তাই সে তার মা এবং ভাইকে মর্যাদা দিতে জানে, সমস্ত মানুষকেই সম্মান দিতে জানে। কিন্তু বিনোদ শিক্ষিত হয়েও এ জিনিস জানে না।

গোকুলের চরিত্র এঁকে এই সত্যটিকেই শরৎচন্দ্র দেখাতে চেয়েছেন। আর দেখাতে চেয়েছেন, প্রকৃত ভ্রাতৃত্ব কী। একথা ঠিক যে, সত্যিকারের ভ্রাতৃত্বের সৌন্দর্যকে দেখানো সত্ত্বেও যে সামাজিক কাঠামোটিকে ভিত্তি করে তার বিকাশ ঘটেছিল — সেই সমাজ আর ফিরে আসবে না। আজ পরিবর্তিত সমাজে একান্নবর্তী পরিবারের বদলে ব্যক্তিকেন্দ্রিক পরিবার গড়ে উঠেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভাইয়ে-ভাইয়ে সেই সুন্দর সম্পর্কটা না থাকার কারণ কী? একের অন্যের উপরে আর্থিক নির্ভরশীলতা না থাকলে ভালবাসার অনুভূতি, স্নেহের সম্পর্কের ক্ষেত্রে তো আগের থেকে উন্নত জিনিসটাই আসার কথা। আগে যা ছিল তার থেকে হীন স্বার্থসম্পন্ন, নিম্নরুচির জিনিস আসবে কেন? তাই শরৎচন্দ্র গোকুলকে এমন একটা মানুষ হিসাবে গড়ে তুলেছেন, যে তার নিজের উপরে শত অপমান হলেও, তার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও, সে কোন মানুষকে অপমান করে না। মানুষকে সে যথার্থই ভালবাসে এবং কীভাবে অন্যকে ভালবাসা দিতে হয়, লেখাপড়া না জেনেও একটা মানুষ তা আয়ত্ত করেছে। ফলে, রুচির মূল জিনিসটা সে আয়ত্ত করেছে। তাই মায়ের সম্ভ্রম কীভাবে রক্ষা করতে হয়, তা সে জানে। তার শ্বশুর হাজার চেষ্টা করেও ভুলিয়ে-ভালিয়ে তাকে দিয়ে তার মায়ের অমতে কাজ করাতে পারে না। তার নিজের স্ত্রীও পারে না। অথচ, আমাদের দেশের শিক্ষিত, রুচিবান, রবীন্দ্রসংস্কৃতির উদ্‌গাতারা পর্যন্ত স্ত্রীর অন্যায় আবদারে কত কাণ্ড করছে! আর একটি অশিক্ষিত লোক, যাকে কথার প্যাঁচে ফেলে সব করানো যায় বলে মানুষ মনে করে, তার একটা জায়গায় কেমন অতি সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধ! তাকে সেখান থেকে কোনমতেই কেউ নড়াতে পারে না।

গোকুলের শ্বশুর তার মেয়েকে হাত করে গোকুলকে বুঝিয়ে দোকানের চাবি হাত করে ফেলেছিল এবং পুরনো কর্মচারী চক্রবর্তীকে তাড়াবার সমস্ত পরিকল্পনাই পাকাপাকি করে ফেলেছিল। সে গোকুলকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ঠিক বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, সৎমা তার সর্বনাশ করছে, চক্রান্ত করছে এবং এই সর্বনাশের হাত থেকে তাকে বাঁচতে হলে চক্রবর্তীকে দোকান থেকে সরাতেই হবে। গোকুলও তার অশিক্ষা ও বুদ্ধির দোষে তাদের চাতুর্যের ফাঁদে পা দিয়ে ফেলল এবং বুঝে ফেলল যে, হ্যাঁ, তাইতো — এ তো সৎমা — সেইজন্যই তাকে দেখতে পারে না। শ্বশুর ও বৌ-এর পরামর্শে সে চক্রবর্তীর কাছ থেকে দোকানের চাবি নিয়ে নিল। গোকুলের শ্বশুর বুঝল যে সব ঠিকঠাক হয়ে গেল, জামাই তার কুক্ষিগত হয়ে গেল। গোকুলের বৌ-ও খুব খুশি হ'ল। সে-ও ভাবল যে, যাক্ এতদিনে মা'র কব্জা থেকে সে তার স্বামীকে নিজের আয়ত্তে আনতে পেরেছে। ফলে, তার মধ্যেও একটা প্রবল বিজয়গর্ব হ'ল।

অথচ, যে গোকুলকে তার বৌ চিনতে পারেনি, শ্বশুর চিনতে পারেনি, মা-ও চিনতে পারেনি — সেই গোকুলকে সামান্য দোকানদার হয়েও চক্রবর্তী কিন্তু ঠিকই চিনেছিল। সে কোন কথা না বলে তৎক্ষণাৎ গোকুলের মা'র কাছে হাজির হয়ে সব ঘটনা তাঁকে জানাল। মা যখন এসে ডাকলেন — "গোকুল", গোকুল কিন্তু তৎক্ষণাৎ সমস্ত ভুলে গিয়ে অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে জবাব দিল — "কেন মা?" মা বললেন — "চক্রবর্তী মশাই অনেক দিনের লোক, তিনি যতদিন বাঁচবেন, আমি ততদিন তাঁকে বহাল রাখলুম। সিন্দুকের চাবি, খাতাপত্র নিয়ে তাঁকে দোকানে যেতে দাও।" গোকুল অমনি ঝনাৎ করে চাবির গোছাটি ফেলে দিল। চক্রবর্তী একটু মুচকি হেসে চাবির গোছাটি নিয়ে চলে গেল। তারপর শুরু হ'ল গোকুলের উপর অশেষ লাঞ্ছনা এবং তিরস্কার। গোকুল সমস্ত কিছু নীরবে সহ্য করে বসে রইল। শুধু লজ্জায় ক্ষোভে কাঁদো কাঁদো হয়ে একটা কথাই সে বলল, "মা যে শত্রুতা করে এমন হুকুম দেবেন তা আমি কী করে জানব?" দেখুন, কী অদ্ভুত! যে সৎমা শত্রুতা করছে, সর্বনাশ করছে, চক্রান্ত করছে — এইসব কথা গোকুলকে বুঝিয়ে সবই ঠিক হয়ে গিয়েছিল, সেই মা-ই যখন একবার মাত্র চক্রবর্তীকে চাবিটা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য গোকুলকে বলে চলে গেলেন — অমনি সব ওলটপালট হয়ে গেল। ব্যস্, আর দোকানে হাত দেওয়া চলল না। বউয়ের কর্তৃত্ব, শ্বশুরের কর্তৃত্ব কিছুই চলল না। এই হচ্ছে গোকুল।

শরৎচন্দ্র এই সামান্য গল্পটির মধ্য দিয়ে যে কথাটি বলতে চেয়েছেন, তা হ'ল, লেখাপড়া একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, কিন্তু সংস্কৃতির মূল সুর শুধুমাত্র উচ্চ ডিগ্রি হলেই আয়ত্ত করতে পারা যায় না। তাই বিনোদ একজন 'গোল্ড মেডালিস্ট' হয়েও যার খবর পায়নি, মূর্খ গোকুল কিন্তু তার সংবাদ পেয়েছে। শুধু তাকে সে প্রকাশ করতে জানে না। মানুষ তাকে ভুল বোঝে, অনেক বিপত্তির সৃষ্টি হয়, ঠিক সময়ে ঠিক কথাটা গুছিয়ে বলতে পারে না বলে যা চায় তা গড়ে তুলতে পারে না — ভেঙে যায়। এইখানেই শিক্ষার প্রয়োজন। এইখানে তিনি বলতে চেয়েছেন, মূর্খ থাকার অনেক বিপদ এবং মূর্খ থেকে কিছুই হয় না। কিন্তু শুধু লেখাপড়া শিখে ডিগ্রি নিলেই কি সংস্কৃতির সুরটি আয়ত্ত করা যায়? দেখ তো, বিনোদ সংস্কৃতিবান, উচ্চ সংস্কৃতি ও মানবিক গুণের অধিকারী, না, এই মূর্খ গোকুলটা মানবিক গুণের বেশি অধিকারী? তোমরা লেখাপড়া শিখে বিনোদ না হয়ে গোকুল যদি হতে পার, তবেই পড়ার সার্থকতা আছে। আর, না পড়ে অন্তত গোকুল হতে পারলে বিনোদের চেয়ে সমাজে তার কার্যকারিতা অনেক বেশি। সে মায়ের মর্যাদা বোঝে। যৌনতার সে দাস নয়। বৌয়ের কথায় মাকে-ভাইকে সে কখনও পথে বসাবে না। অথচ, আজকের দিনের আমাদের দেশের তথাকথিত কমিউনিস্টদের এবং প্রগতিশীল আন্দোলনের লোকেদের মাকে পথে বসিয়ে বউকে নিয়ে ফ্ল্যাটে উঠতে দেখতে দেখতে আমার চুল পেকে গেল। শরৎচন্দ্র এইসব তত্ত্বকথাগুলোই বলেছেন রসের মাধ্যমে। তিনি তত্ত্বকথা লিখে কোথাও বোঝাতে চাননি — আমি এইখানে এই তত্ত্ব আলোচনা করছি, এই বক্তব্য রাখছি। সাহিত্যিক হিসাবে এইখানে তাঁর সার্থকতা সব চাইতে বেশি। ... ফলে, শরৎচন্দ্রের মূল্যায়ন হলে, শরৎচন্দ্রকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তে থাকলে আজকের দিনে সমগ্র দেশে যে নৈতিকতার অধঃপতন ঘটেছে এবং যার প্রভাব বামপন্থী আন্দোলনেও এসে বর্তাচ্ছে — সেই নৈতিকতা একটা নতুন মানে খুঁজে পাবে। তার মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্তন আসবে। আধুনিক সাংস্কৃতিক ধ্যানধারণার মধ্যেও একটা বিরাট পরিবর্তন আসবে।

সকলেই স্বীকার করবেন যে, সমস্ত যুগে স্তরে স্তরে যে উন্নত চরিত্র, উন্নত চিন্তার সৃষ্টি হয়েছে, তারই ধারায় বুর্জোয়া বিপ্লববাদী চিন্তাধারা থেকেও উন্নত স্তরের সর্বহারার চিন্তাধারার সৃষ্টি হয়েছে। তাহলে বুর্জোয়া বিপ্লব যে মানুষগুলো, যে চরিত্রগুলো সৃষ্টি করেছে, সর্বহারা বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যে মানুষগুলো, চরিত্রগুলো সৃষ্টি হবে — সেগুলো পুরনো দিনের হিউম্যানিস্ট বিপ্লবী, অর্থাৎ বুর্জোয়া বিপ্লববাদের সর্বশ্রেষ্ঠ চরিত্রগুলোর চেয়েও উন্নত স্তরের চরিত্র হবে তো? অথচ, আমাদের সমাজে বাস্তবে কী দেখতে পান? শরৎচন্দ্রের আমলে ঐরকম যে কোমরভাঙা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন — যার মধ্যে কত দুর্বলতা ছিল, যে আন্দোলন ধর্ম থেকে মুক্ত হতে পারেনি — সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেও যার মূল ধারাটি আপসহীন ছিল না, যে সময়ে নেতারাও রাজনৈতিক আন্দোলনের তাড়াহুড়োয় সমাজবিপ্লবের ঝান্ডাটি ফেলে দিয়েছিলেন — রাজনৈতিক আন্দোলনের সর্বশ্রেষ্ঠ বাহিনী যাঁরা, সবচেয়ে অগ্রণী অংশ যাঁরা, তাঁরাও তখন ধর্মের সঙ্গে ও ঐতিহ্যের সঙ্গে আপস করেছেন — আপস করেছেন সামাজিক ক্ষেত্রে, ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে এমনকী পারিবারিক ক্ষেত্রেও ; আমাদের মনে রাখা দরকার, তেমন একটা সময়েও শরৎসাহিত্যের মতো সাহিত্যের কার্যকারিতা ছিল বলেই সেই আন্দোলনের ভাবধারায় যারা প্রভাবিত হয়েছে, বাংলা দেশের সেই যুবকদের মধ্যে, বিপ্লবীদের মধ্যে

চরিত্রের যে দৃঢ়তা দেখতে পেয়েছি, আজ কমিউনিস্টরা, যাঁরা তাঁদের চেয়ে অনেক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা করেন, বিশ্লেষণ করেন, বক্তৃতাবাজি করেন, কিন্তু চরিত্রের সেদিনকার সেই উন্নত মানটুকু পর্যন্ত তাঁরা বজায় রাখতে পারছেন না। আজকের দিনের কমিউনিস্টদের যেখানে দেশবন্ধু সি আর দাসের চেয়েও, ক্ষুদিরামের চেয়েও উন্নত মডেলের হওয়ার কথা — সেখানে সেটুকু হওয়া তো দূরের কথা, তার চেয়েও অধঃপতিত মান এদের। কারণ হচ্ছে, এদেশে শরৎ সাহিত্যের যথার্থ মূল্যায়ন করতে না পারা, এমনকী তথাকথিত প্রগতিশীলদের দ্বারা তাঁর অস্বীকৃতি, মানুষ শরৎচন্দ্রকে ঠিকমতো বুঝতে না পারা। এর ফলেই অতীতের থেকে ছেদ ঘটাতে গিয়ে আমরা কনটিনিউয়িটির সুরটি হারিয়ে ফেলেছি এবং ছিন্নমূল হয়ে পড়েছি।

যে গোকুলকে বুঝতে পারেনি, যারা গোকুলই হতে পারল না — চূড়ান্ত বোকামি এবং অশিক্ষার দরুন তার আপাতদৃষ্ট অশালীন উক্তি ও অর্থহীন আচরণের মধ্যেও যে একটা সুদৃঢ় সাংস্কৃতিক মান ও নৈতিক আধার বর্তমান, তা যারা লক্ষ্য করতে পারল না — তার থেকে যারা কিছুই শিখতে পারল না — তারা কি কোনদিন কমিউনিস্ট হতে পারে? গিরীশ এবং যাদবই যারা হতে পারল না — তারা কখনও কমিউনিস্ট হতে পারে না। আমাদের সমাজের যাদবকে, গিরীশকে যে বোঝে, গোকুলকে যে বোঝে, বুঝে যে তার সবটুকু রস নিঙড়ে নিয়ে তার সীমাবদ্ধতা বুঝতে পেরে তার থেকে আরও এগিয়ে গিয়েছে — সেই তো হবে কমিউনিস্ট। যারা গোকুলই হতে পারেনি — যারা বিনোদ এবং হরিশের জাত— গোকুলের চরিত্রে যে সংস্কৃতির সুরটি নিহিত, তার খবরই যারা রাখে না — তারা কমিউনিজমের বুক্‌নির আড়ালে কমিউনিস্ট হয় নাকি? বিনোদের দল, হরিশের দল কমিউনিস্ট হয় না। গোকুল, যাদব, গিরীশের দলই বিকাশের পথে কমিউনিস্ট হয়। নারীদের মধ্যে বিন্দু, নারায়ণী, হেমাঙ্গিনী, 'নিষ্কৃতি'র ছোট-বৌ, বড়-বৌ — এই জাতের নারীরাই সুযোগ পেলে বিকাশের পথে সত্যিকারের কমিউনিস্ট হতে পারে।

যেসব সাহিত্যিকরা তাঁদের সাহিত্যের মধ্যে অন্তঃসারশূন্য কতগুলো বড় বড় বক্তৃতা করেন এবং যেসব সাহিত্য সমালোচক সেইসব বড় বড় কথাগুলির মাপকাঠিতেই বিচার করেন শরৎসাহিত্যের চেয়েও সেইসব সাহিত্য কত বেশি প্রগতিশীল — আসলে কিন্তু সেইসব সাহিত্যিকরা এবং সাহিত্য সমালোচকরা উভয়েই হচ্ছেন ঐ 'বৈকুণ্ঠের উইল'-এর বিনোদ এবং 'নিষ্কৃতি'-র হরিশ ও মেজবৌ-এর জাত। এইসব সাহিত্যিকরা ও সাহিত্য সমালোচকরা শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন গল্প-উপন্যাসের নারী ও পুরুষ চরিত্রগুলোর যথার্থ তাৎপর্যই ধরতে পারেননি।

...তাই বলছিলাম, নারায়ণীর মতো মেয়েরা কমিউনিস্ট হয়, নারায়ণীর মা এবং মেজবৌয়ের জাতটা কমিউনিস্ট হয় না। লেখাপড়া শিখলেও হয় না। লেখাপড়া শিখলে এই ধরনের মেয়েরা বড় জোর 'শেষপ্রশ্নে'র বেলা হবে, কমল হবে না। কমলের জাতটা জ্ঞান অর্জন ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিকাশের পথে কমিউনিস্ট হয়। বেলার জাতটা নারী স্বাধীনতার অর্থ বুঝবে স্বামীর সঙ্গে বনিবনা না হলে চুলচেরা মামলা-মোকদ্দমা করে তার মাইনে এবং সম্পত্তিতে কতটা ভাগ বসানো যায়। 'তুমি আমাকে বিয়ে করেছ — ডিভোর্স হয়েছে যখন, তখন আমাকে খোরপোষ দেবে না কেন?' এইসব তথাকথিত স্বাধীনচেতা নারীরা সহজ বুদ্ধিতে এই সাধারণ কথাটা বোঝে না যে, বিয়ে তো শুধু সে আমাকে করেনি, আমিও তো তাকে করেছি। খাওয়াতে হলে সে শুধু আমাকে খাওয়াবে কেন — আমিও তো তাকে খাওয়াব। যদি কেউ যথার্থ স্বাধীনচেতা, শিক্ষিতা এবং নারীত্বের অধিকারিণী হন, নারীত্বের যদি বিন্দুমাত্র মর্যাদাবোধ তাঁর থাকে — তাহলে কি কোন মেয়ে বলতে পারে, 'আমাকে বিয়ে করেছ, তাহলে খাওয়াবে না কেন?' সাধারণ লেখাপড়া না-জানা পুরনো সমাজের সাধারণ মেয়েরা এভাবে ভাবতে পারে। তাদের আমি দোষ দিই না। কিন্তু যারা লেখাপড়া শিখেছে এবং গণতন্ত্র ও সমানাধিকারের কথা বলে, তারা পর্যন্ত এইভাবে চিন্তা করে থাকে। স্কুল-কলেজে পড়াশুনা করছে, তারাও এইভাবে ভাবনা-চিন্তা করে থাকে। আজকের দিনের বেশিরভাগ ছেলেমেয়েদের মধ্যেই ভালবাসা কী, স্নেহ-মমতা কী, আত্মমর্যাদাবোধ কী, নারীত্বের মূল্য কী, সে সম্পর্কে কোন ধারণা গড়ে ওঠেনি কেন? বড় বড় কথা আমাদের দেশে কম লেখক বলেছেন কি? কিন্তু শরৎচন্দ্রকে ঠিকভাবে বুঝতে পারলে চিন্তাভাবনার মোড় পাল্‌টে যাবে। প্রত্যেকে বুঝবে মর্যাদা হারিয়ে কিছু পাওয়ার মধ্যে মনুষ্যত্ব নেই। নারীরাও এইভাবে ভাববেন। খাওয়া-পরা, সুখ-সম্পদ, যৌনজীবন, ভালবাসা, স্নেহ-প্রীতি-মমতা সবই মানুষের জীবনে দরকার। কিন্তু মর্যাদা হারিয়ে যিনি এগুলো পেলেন তাঁর আর রইল কী? এইসব বোধগুলো সমাজজীবনে একবারে মরে গেছে। শরৎচর্চা এই বোধগুলিকে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রেও সাহায্য করবে।

... অনেক তথাকথিত কমিউনিস্ট ও প্রগতিশীল সমালোচকদেরও বলতে শুনেছি যে, শরৎচন্দ্র 'বিপ্রদাস' বইখানিতে হিন্দু 'রিভাইভ্যালিজম্'-এর পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। আমি তাঁদের সঙ্গে পুরোপুরি একমত নই। আমার মনে হয়, এঁরা 'বিপ্রদাস' বইখানা উপর উপর পড়েছেন। ভাল করে পড়েননি, অথবা পড়ে থাকলেও, এই বইখানার মধ্য দিয়েও শরৎচিন্তার যে মূল সুরটি বেরিয়ে এসেছে তা তাঁরা ধরতে পারেননি। তবে একথা সত্য, স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে হিন্দু রিভাইভ্যালিজম্-এর যে প্রভাব ছিল, শরৎচন্দ্রের একখানা উপন্যাসের মধ্যেই কেবলমাত্র আমরা তার প্রভাব দেখতে পাই — সেটি হ'ল 'বিপ্রদাস'। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আলোচনার আগে যে কথাটি আমাদের মনে রাখা দরকার, তা হ'ল একজন সাহিত্যিকের মধ্যেও সমাজের বহু ভাবনাধারণার ঘাত-প্রতিঘাত ঘটে থাকে। কিন্তু কোন সাহিত্যিকের সাহিত্যচিন্তার প্রকৃতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাঁর সাহিত্যচিন্তার প্রধান দিকটির প্রকৃতি কী, তা নির্ধারণ করা দরকার। যেমন ধরুন, দোষ-গুণ মিলিয়েই তো মানুষ। যখন কোন মানুষকে আমরা ভাল বলি তখন তার মধ্যে এতটুকুও কি দোষের দিক থাকে না? তাহলে দোষে-গুণে মিলিয়ে যে মানুষ, সেই মানুষকে আমরা কী দিয়ে বিচার করি? বিচার করি তার গুণ ও দোষের মধ্যে কোন্ দিকটা প্রধান। গুণের দিকটা বড়, না দোষের দিকটা বড়। যার দোষের দিকটাই বড়, তাকে আমরা বলি খারাপ মানুষ। আর দোষ-গুণের মধ্যে যার গুণের দিক্‌টাই বড়, তাকে আমরা বলি ভাল মানুষ। এইভাবে যে কোন জিনিসের চরিত্র — তার প্রধান দিকটা কী তা দিয়েই বিচার করতে হয়।

এই দৃষ্টিকাণ থেকে বিচার করলে 'বিপ্রদাস' বইখানা সম্পর্কে পূর্বোক্ত সমালোচকদের মতামত যদি পুরোপুরি মেনেও নেওয়া যায়, তাহলেও একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, শরৎচন্দ্রের সাহিত্যচিন্তার প্রধান দিকটাই হচ্ছে — আপসহীন, ধর্মনিরপেক্ষ, যৌবনোদ্দীপ্ত, বিপ্লবাত্মক মানবতাবাদ।

'বিপ্রদাস' বইখানা সম্পর্কে আমার অভিমত হচ্ছে, স্বদেশি আন্দোলনের মধ্যে হিন্দু রিভাইভ্যালিজম্-এর যে প্রভাব বর্তমান ছিল তার প্রবল চাপ এড়াতে না পেরে শরৎচন্দ্র অতি যত্নে এবং অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বিপ্রদাস এবং দয়াময়ীর চরিত্র দু'টি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তাঁর কলমের জোর এবং প্রকাশভঙ্গিমার অপূর্ব দক্ষতার জন্যই বইখানির প্রথম দিকে চরিত্র দুটো খানিকটা উতরে গেলেও শেষপর্যন্ত দুটো চরিত্রই মাটি হয়ে গিয়েছে। চোখ থাকলেই ধরা পড়বে, বিপ্রদাসকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের এমন যে শক্তিশালী কলম, তা-ও যেন থিতিয়ে যাচ্ছে। তাঁর লেখার যে রসঘন সাবলীল ভঙ্গি, বিপ্রদাস ও দয়াময়ীর চরিত্রচিত্রণের ক্ষেত্রে তা তেমনভাবে খেলেনি। শুধু কতগুলো কথা সাজিয়ে এবং খানিকটা ভাবগম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি করেই তিনি বিপ্রদাসের চরিত্রটি সুন্দর করে গড়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। অথচ যখনই তিনি দ্বিজদাস, বন্দনা, এমনকী বইয়ের মধ্যে অত্যন্ত নগণ্যও স্থান যিনি অধিকার করে রয়েছেন সেই মিঃ রে-কে উপস্থিত করেছেন, তখনই যেন তাঁর কলম মুখর হয়েছে এবং স্বাভাবিক গতিবেগ পেয়েছে এবং প্রকাশভঙ্গিমাও যথার্থ রসোত্তীর্ণ হয়েছে। কাজেই এটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে, এত চেষ্টা সত্ত্বেও 'বিপ্রদাস' বইয়ে বিপ্রদাস ও দয়াময়ীর চরিত্রচিত্রণের প্রয়াস তাঁর একটা ব্যর্থ চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। অত বড় ক্ষমতাশালী লেখক হওয়া সত্ত্বেও রিভাইভ্যালিস্ট চরিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে তাঁর হাতে পড়ে বিপ্রদাস ও বিপ্রদাসের মা — এই দু'টি চরিত্রই মাটি হয়ে গেছে। বস্তুত এই উপন্যাসে মহৎ হয়ে যারা ফুটে উঠেছে, তারা না বিপ্রদাস, না তার মা। শেষ পর্যন্ত দ্বিজদাস, বন্দনা ও তার আত্মভোলা বাবার চরিত্রই বড় হয়ে ফুটে উঠেছে।

এইভাবে বুঝলে বোঝা যাবে, চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে তাঁর মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ এই বইটিতেও তাঁর অজ্ঞাতসারে প্রাধান্য পেয়েছে।...

* * *

... তৎকালীন সময়ে সাহিত্যচিন্তার ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র মূলত একজন 'সেক্যুলার হিউম্যানিস্ট' ছিলেন — মার্কসবাদী ছিলেন না। আমরা কমিউনিস্টরা যে চিন্তাভাবনাকে লালনপালন করি — সেই চিন্তাভাবনা বা ধ্যানধারণা শরৎসাহিত্যে প্রতিফলিত হয়নি। ফলে, সর্বহারা সংস্কৃতির তিনি জন্ম দিয়েছেন কি না, বা মজুর-চাষীর বিপ্লবের কথা তাঁর কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়েছে কি না — এ অন্তত তাঁর সাহিত্য আলোচনার ক্ষেত্রে বিচার্য বিষয় নয়। শরৎসাহিত্যের বিচারের ক্ষেত্রে হামেশাই যাঁরা এ ধরনের প্রশ্ন তোলেন, তাঁরা আসলে 'ধান ভানতে শিবের গীত' শুরু করেন। আমরা আলোচনা করছি — তখনকার সামাজিক পরিস্থিতিতে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে আমাদের দেশে মানবতাবাদী চিন্তাধারার সবচেয়ে প্রগতিশীল চিন্তার ধারক-বাহক

কারা ছিলেন। অর্থাৎ ভারতবর্ষে তখনকার পরিস্থিতিতে বুর্জোয়া মানবতাবাদের সবচাইতে প্রগতিশীল চিন্তাভাবনা কারা প্রতিফলিত করেছেন। পেটিবুর্জোয়া বিপ্লববাদীরা কি? পেটিবুর্জোয়া বিপ্লববাদই যদি তখনকার পরিস্থিতিতে বুর্জোয়া মানবতাবাদের সবচাইতে প্রগতিশীল চিন্তা হয়ে থাকে তবে শরৎচন্দ্র সেই চিন্তাকেই মূলত তাঁর সাহিত্যে প্রতিফলিত করেছেন। কাজেই, তৎকালীন যুগের বুর্জোয়া মানবতাবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রগতিশীল চিন্তার মান এবং রুচির মানই এদেশে শরৎসাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও শ্রমিকশ্রেণীর চিন্তাভাবনার কত কাছাকাছি এসে গিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র। শরৎচন্দ্রের জীবদ্দশাতেই, তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ে এদেশে শ্রমিক আন্দোলনের জন্ম হয়ে গিয়েছিল। ফলে, লেনিনের মতো একটি সঠিক মার্কসবাদী নেতৃত্ব যদি সেই সময় এদেশে থাকত এবং সেই নেতৃত্ব যদি সঠিক লাইনে সাহিত্যকে প্রভাবিত করত, তাহলে গোর্কির মতো শরৎচন্দ্র মারফতই এদেশে হয়তো সর্বহারা সাহিত্যের জন্ম হওয়া একেবারে অসম্ভব ছিল না। আর হলে তা গোর্কির চেয়ে অনেক উন্নত ধরনের সাহিত্য হ'ত। কারণ, শরৎচন্দ্রের শিল্পশৈলী গোর্কির থেকে নিঃসন্দেহে উন্নত ধরনের।

এ সম্পর্কে শরৎসাহিত্য থেকে দু'একটি উদাহরণ আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরব। মানবতাবাদী মূল্যবোধ এবং তৎকালীন সময়ে উচ্চ রুচির মান প্রতিফলিত করার দিক থেকে 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের সাহিত্যমূল্য যাই থাকুক না কেন, শ্রমিক সংস্কৃতির অর্থে তার মূল্য কতটুকু? কিন্তু, তবুও দেখুন, 'শ্রীকান্ত'র তৃতীয় পর্বের একটা জায়গায় যেখানে রেললাইন বসানোর কাজ চলছিল এবং শ্রীকান্ত মজুর বস্তির মধ্যে একটা রাত কাটাতে বাধ্য হয়েছিল, সেখানে মজুরদের চূড়ান্ত দুরবস্থা দেখে শ্রীকান্তর মুখ দিয়ে যে কথাটা বেরিয়ে এসেছে, সেটা ঠিক মানবতাবাদীদের মতো কথা নয় — তার থেকেও উন্নত চিন্তাকে প্রতিফলিত করেছে। যেমন, শ্রীকান্ত মজুরদের অসহনীয় অমানুষিক দুর্দশা দেখে বলছে, "আধুনিক সভ্যতার বাহন তোরা — তোরা মর্। কিন্তু যে নির্মম সভ্যতা তোদের এমনধারা করিয়াছে, তাহাকে তোরা কিছুতেই ক্ষমা করিস না। যদি বহিতেই হয়, ইহাকে তোরা দ্রুতবেগে রসাতলে বহিয়া নিয়া যা।"

'পথের দাবী'-তেও শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে শরৎচন্দ্র যে দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন, তা পুরোপুরি মার্কসবাদসম্মত না হলেও নিঃসন্দেহে তা মজুর আন্দোলনে অর্থনীতিবাদ ও সংস্কারবাদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদের কণ্ঠস্বরকে প্রতিফলিত করেছে।...

... তিনি সেখানে পরিষ্কারভাবে দেখিয়েছেন, যারা মাহিনা বৃদ্ধির এবং কিছু কিছু সংস্কারের জন্য মজুর আন্দোলন করে, বা মজুরদের সংগঠিত করে, তারা মজুর দরদের আলখাল্লার আড়ালে মজুরদের সর্বনাশ করে সবচাইতে বেশি। তারা আসলে এই কাজের দ্বারা বিপ্লবেরই বিরোধিতা করে।

... শরৎচন্দ্র 'পথের দাবী' উপন্যাসে দর্শনের দিক থেকেও নানাভাবে কতকগুলো কথা বলেছেন। সেই কথাগুলির মাধ্যমে তিনি যেন মানবতাবাদী চিন্তার সীমাকে ছাড়িয়ে যেতে চাইছেন। ... আজকের দিনে মানবতাবাদী মূল্যবোধ একটা ধাঁচে এসে গিয়েছে। তা ভাল-মন্দ, রুচি এবং সৌন্দর্য সম্পর্কিত ধারণার ক্ষেত্রে একটা শাশ্বত রূপ বা কাঠামো দাঁড় করিয়েছে। যে ধারণাগুলি একদিন পুঁজিবাদী বিপ্লবের প্রয়োজনে, উৎপাদনের বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের প্রয়োজনে গড়ে উঠেছিল, পরবর্তীকালে মানবতাবাদীরা তাকে স্থায়ী, শাশ্বত হিসাবে মর্যাদা দিয়ে এক জায়গায় দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছে। বুর্জোয়া মানবতাবাদীদের সৌন্দর্যবোধ, নীতি-নৈতিকতা ও রুচি সংক্রান্ত এই ধরনের শাশ্বত ধারণা ও মার্কসবাদীদের সৌন্দর্যবোধ, নীতি-নৈতিকতা ও রুচি সম্পর্কিত ধারণার মধ্যে ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার একটা সংযোগ থাকলেও — এই দু'টি আসলে সম্পূর্ণ আলাদা আদর্শগত কাঠামো। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ যে প্রয়োজনতত্ত্বের কথা বলে, তা বাস্তব থেকে উদ্ভূত। মার্কসবাদ অনুযায়ী যে প্রয়োজনতত্ত্বের আলোকে সমাজের ভাব, আদর্শ, চিন্তাভাবনাগুলোর সত্যাসত্য নির্ধারিত হয় — তা ব্যক্তির হীন স্বার্থবোধ বা প্রয়োজন নয়। 'পথের দাবী'-তে দেখুন অনেকটা এইরূপ যুক্তিধারা ও চিন্তাধারারই যেন প্রতিফলন ঘটেছে। যদিও তার মধ্যে চিন্তার প্রধান দিকটাই পেটিবুর্জোয়া বিপ্লববাদ, এদেশের বিশেষ পরিস্থিতিতে 'এনার্কিজম্' (নৈরাজ্যবাদ) যে রূপ পরিগ্রহ করেছিল তা এবং যৌবনোদ্দীপ্ত মানবতাবাদই প্রতিফলিত হয়েছে — তবুও অনেক জায়গাতেই তাঁর এই বইখানিতে তিনি মানবতাবাদী চিন্তাকেও ছাড়িয়ে যেতে চেয়েছেন এবং কমিউনিস্ট চিন্তাধারা ও বিচারধারার কিছু কিছু জিনিস যেন বিদ্যুৎ চমকের মতো তার মধ্যে খানিকটা জায়গা করে নিয়েছে। 'পথের দাবী'-তে এক জায়গায় সব্যসাচীর মুখ দিয়ে তিনি বলছেন, "এই পরিবর্তনশীল জগতে সত্যোপলব্ধি বলিয়া কোন নিত্যবস্তু নাই। তাহার জন্ম

আছে, মৃত্যু আছে। যুগে যুগে কালে কালে মানবের প্রয়োজনে তাহাকে নূতন হইয়া আসিতে হয়। অতীতের সত্যকে বর্তমানে স্বীকার করিতেই হইবে — এ বিশ্বাস ভ্রান্ত, এ ধারণা কুসংস্কার।" শরৎচন্দ্রের সত্য সম্পর্কে এই ধরনের চিন্তাভাবনা ও বিচারধারার মধ্যে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ও কমিউনিস্ট চিন্তাভাবনা ও বিচারধারার যথেষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

'পথের দাবী'-র আর একটা জায়গায় সব্যসাচী বলছেন, "পথের দাবীর ভালমন্দ দিয়েই আমার সত্য-মিথ্যা নির্ধারিত হয়। এই আমার নীতিশাস্ত্র, এই আমার অকপট মূর্তি। তোমরা বল চরম সত্য, পরম সত্য — এই অর্থহীন নিষ্ফল শব্দগুলো তোমাদের কাছে মহামূল্যবান। মূর্খ ভোলাবার এতো বড় যাদুমন্ত্র আর নেই। আমি মিথ্যে বলিনে, প্রয়োজনে সত্য সৃষ্টি করি।" অর্থাৎ তিনি বলতে চাইছেন, দেশের স্বাধীনতার প্রশ্নের সঙ্গে পথের দাবী সংগঠনের প্রয়োজন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আর, স্বাধীনতার প্রশ্নের সঙ্গে ভারতের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের প্রশ্নটি জড়িয়ে আছে। তাই যা পথের দাবীর প্রয়োজন, তা স্বাধীনতার প্রয়োজন, এবং যা স্বাধীনতার প্রয়োজন, তাই-ই সব্যসাচীর কাছে সত্য। দেখুন, তারপরেই আবার তিনি বলছেন, "সব্যসাচীর প্রয়োজন এবং ব্রজেন্দ্র'র প্রয়োজন এক নয়।" অর্থাৎ এখানে সত্যিকারের নৈর্ব্যক্তিক প্রয়োজনের সঙ্গে তিনি হীন ব্যক্তি প্রয়োজনের পার্থক্য নির্ণয় করে দেখাতে চেয়েছেন। তা না হলে, যে কোন মানুষই তো তার ব্যক্তি প্রয়োজনটিকেই সত্য বলে চালাতে পারে। তাই প্রয়োজন বলতে মানুষের ব্যক্তিগত কোন প্রয়োজন উপলব্ধিকে তিনি বোঝাতে চাননি। সমাজ, মানুষ এবং ইতিহাসের যেটা নির্বিশেষ এবং সত্যিকারের প্রয়োজন, তিনি সেই প্রয়োজনটাকেই ইঙ্গিত করেছেন। তাই সব্যসাচী ভারতীকে বোঝাচ্ছেন — 'স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজন হলে রক্তের হোলি খেলতে হবে এবং তার জন্য দরকার হলে মানুষও খুন করতে পারি — কিন্তু সব্যসাচীর প্রয়োজন এবং ব্রজেন্দ্র'র প্রয়োজন এক নয়।' এই দু'জনের প্রয়োজন সম্পর্কিত উপলব্ধি এক নয় বলেই, ব্রজেন্দ্র ব্যক্তিগত আক্রোশে মানুষ খুন করে। নিজের বিপদ থাক আর না থাক, খুন করার সুযোগ পেলেই সে মানুষ খুন করে। আর, যে সব্যসাচীর জীবন অপূর্ব'র বিশ্বাসঘাতকতার ফলে চূড়ান্তভাবে বিপন্ন হয়ে পড়েছিল, তিনিই অপূর্বকে সবচেয়ে বেশি উদারতা দেখালেন। অন্য সবাই যখন অপূর্ব'র জীবন নেওয়ার জন্য অন্ধের মতো, যন্ত্রের মতো 'ডিসিপ্লিন'কে আঁকড়ে ধরে বসে আছে — ডিসিপ্লিন-ও যে প্রয়োজন থেকে উদ্ভূত এবং তা যে প্রয়োজন অনুসারেই 'রিমোল্ডেড' (পুনর্বিন্যস্ত) হয় — এই বোধও যখন অন্যেরা হারিয়ে ফেলেছে, তখন সব্যসাচী কিন্তু তাঁর নিজের জীবন যার জন্য বেশি বিপন্ন হয়েছিল তাকেই বাঁচিয়ে দিলেন।

এই অপূর্বকে বাঁচিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রেও তাঁর যুক্তিধারা কী অদ্ভুত দেখুন। তিনি বলছেন, "অপূর্ববাবু যা করে ফেলেছেন, সে আর ফিরবে না। তার ফলাফল আমাদের নিতেই হবে। শাস্তি দিলেও হবে, না দিলেও হবে।" আজকের দিনে আমরা যেমন দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে বিচার করি যে, একটা বিভ্রান্ত লোক আমাদের অনেক অনিষ্ট করতে পারে, আবার একটা লোক নিশ্চিতভাবে শত্রুপক্ষের এজেন্ট হয়েও আমাদের অনেক অনিষ্ট করতে পারে — কিন্তু এই দুটো লোককে কোনমতেই এক দৃষ্টিতে দেখা যায় না। ঠিক তেমনি সব্যসাচী যে অপূর্বকে বাঁচিয়ে দিলেন, তার কারণ, তিনি একজন প্রকৃত বিশ্বাসঘাতক এবং একজন দুর্বল চরিত্রের মানুষের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পেরেছিলেন। তাই তিনি অপূর্ব সম্পর্কে এক জায়গায় ভারতীকে বলছেন, "বাস্তবিক বলছি তোমাকে, এত ছোট, এত হীন সে কখনো নয়। ... লেখাপড়া শিখেছে, ভদ্রলোকের ছেলে — পরাধীনতার লজ্জা সে অনুভব করে। আরো দশজন বাঙালীর ছেলের মত সত্যসত্যই সে স্বদেশের কল্যাণ প্রার্থনা করে।" আর এক জায়গায় বলছেন, "অপূর্ব ট্রেটর নয়, স্বদেশকে ও সমস্ত হৃদয় দিয়েই ভালবাসে। কিন্তু, অধিকাংশ — থাক্, স্বজাতির নিন্দা আর করব না — কিন্তু বড় দুর্বল।" অর্থাৎ সব্যসাচী বলতে চাইছেন, এইসব দিকগুলো থাকা সত্ত্বেও অপূর্ব বড় দুর্বল। আমাদের বহু বাঙালির মতো অনেকটা তার অবস্থা। কিন্তু অপূর্ব এবং ভারতীর জীবনকে কেন্দ্র করে যে সৌন্দর্য এবং মাধুর্য গড়ে উঠেছে, তার কি কোন মূল্য নেই? তাই সব্যসাচী ভারতীকে বলছেন, "যে বস্তু তোমাদের মত এই দুটি সামান্য নরনারীকে উপলক্ষ্য করে গড়ে উঠেছে তার কি দাম নেই না কি যে, ব্রজেন্দ্র'র মত বর্বরগুলোকে দেব তাই নষ্ট করে ফেলতে? শুধু এই ভারতী, শুধু এই। নইলে মানুষের প্রাণের মূল্য আছে নাকি আমাদের কাছে। একটা কানাকড়িও না।" এই ধারণাগুলো সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনিই প্রথম এদেশে এনেছেন।

... মূলত মজুরদের নিয়ে শরৎচন্দ্র সাহিত্য রচনা করেননি। কিন্তু তিনি চাষী-মজুরদের কথা একেবারেই ভাবেননি — এ ধারণাও সত্য নয়। মজুরদের কথা তিনি অন্যান্য উপন্যাসে কিছু কিছু বলেছেন এবং 'পথের

দাবী'-তে মজুর আন্দোলন যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করেছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, তিনি তখনকার দিনে কলকাতার আশেপাশে একটা সমাজতান্ত্রিক 'গ্রুপ'ও খাড়া করেন। ... একজায়গায় শ্রমিক আন্দোলনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, "দেখ, আজ আমাদের দেশের শ্রমিকরা জাগ্রত নয়, সঙঘবদ্ধ নয়, পীড়ন এবং শোষণও তাদের উপরে অকথ্য বর্বরভাবে চলছে। আজ তোমাদের দরকার রয়েছে তাদের জাগাবার কাজে, সঙঘবদ্ধ করবার কাজে আত্মনিয়োগ করবার জন্যে। কিন্তু জেনো, যেদিন এদের ঘুম ভাঙবে, এদের ভিতরে সঙঘবদ্ধ তা আসবে, সেদিন ওদের নিজেদের ভিতর থেকেই ওদের নেতা তৈরি হবে; সেদিন তোমরা হবে অনাবশ্যক। সেদিন যাতে ওদের পরিচালনার ভার ওদের নেতাদের হাতেই ছেড়ে দিয়ে খুশী মনে চলে আসতে পার, তোমাদের মনকে এমনিভাবেই তৈরি করে তোলা দরকার। কাজ করবার সঙ্গে সঙ্গে যেন চিরকাল ওদের নেতৃত্ব করবার মোহ মনের মধ্যে না জন্মায়।"

... তাঁর 'পথের দাবী'-র মধ্যে দেখবেন, শ্রমিক ধর্মঘটের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি এমন সব কথা বলেছেন, যে কথাগুলো মার্কসবাদের প্রায় কাছাকাছি, শ্রেণীসংগ্রাম সম্বন্ধে কথা। অথচ, তিনি হচ্ছেন আসলে কিন্তু পেটিবুর্জোয়া বিপ্লববাদের লেখক, মানবতাবাদের লেখক। কিন্তু যেহেতু সেদিন স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে মার্কসবাদ বা শ্রমিক আন্দোলনের চিন্তাভাবনাগুলো এসে ধাক্কা দিচ্ছে — শরৎচন্দ্র বিপ্লবাত্মক মানবতাবাদের উত্তরসাধক ছিলেন বলেই তার অনেকখানি কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলেন। তাই সব্যসাচীর মুখ দিয়ে তিনি ধর্ম সম্বন্ধে বলছেন, "সমস্ত ধর্মই মিথ্যা — আদিম দিনের কুসংস্কার। বিশ্বমানবতার এতবড় পরম শত্রু আর নেই।" অথচ, আমাদের দেশের পেটিবুর্জোয়া বিপ্লববাদীদের মধ্যেও সেদিন এই চিন্তা অকল্পনীয় ছিল। ...

শরৎসাহিত্যে আরও কিছু কিছু সুন্দর দিক আছে। সে সম্পর্কেও খানিকটা আলোচনা হওয়া দরকার। যেমন ধরুন, তাঁর 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাস। এই উপন্যাসখানিতে বুর্জোয়া বিপ্লবের প্রথম যুগের ভালবাসার স্বাধীনতা সম্পর্কে যে ধারণা গড়ে উঠেছিল — বুর্জোয়া বিপ্লববাদের প্রথম যুগের ভালবাসার স্বাধীনতার সেই রূপটিই তিনি ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বুর্জোয়া বিপ্লববাদের স্বাধীনতার এই রূপটি অনেকটা একদেশদর্শী। ইউরোপের বুর্জোয়ারা স্বাধীন মানসিকতার নামে যে ধরনের চর্চা করেছে তা বিলাসিতায় পর্যবসিত হয়ে গিয়েছিল। শরৎচন্দ্র তাঁর 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসে পুরনো কূপমণ্ডুকতা, ধর্মান্ধতা, কোন কিছুকে অনুশাসনের মাধ্যমে চিরস্থায়ী করে পাওয়ার চেষ্টা — এই ধরনের মানসিকতাগুলোর বিরুদ্ধে কমলকে অতি যত্নে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। এরই সাথে সাথে কমলের একদেশদর্শিতার দিকটা দেখাবার জন্য রাজেনকে এনে খাড়া করেছেন। এই ধরনের চিন্তা কিন্তু আমরা অতীতের মানবতাবাদী সাহিত্যে পাব না, রেনেসাঁস যুগের সাহিত্যেও পাব না — পাব একমাত্র শরৎসাহিত্যে।

'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসে রাজেন কমলকে বলছে যে, হরেন্দ্র'র আশ্রম ছেড়ে সে চলে যাবে। সে বলছে, "তাদের সঙ্গে আমার মতেও মেলে না, কাজের ধারাতেও মেলে না। মেলে শুধু ভালবাসা দিয়ে।" তখন কমল বলছে, "এর চেয়ে বড় আর কি আছে রাজেন? মন যেখানে মিলেছে, থাক না সেখানে মতের অমিল। হোক না কাজের ধারা বিভিন্ন;কি যায় আসে তাতে? সবাই একই রকম ভাববে, একই রকম কাজ করবে, তবেই এক সঙ্গে বাস করা চলবে এ কেন? আর, পরের মতকে যদি শ্রদ্ধা করতেই না পারা গেল তো সে কিসের শিক্ষা?" কমলের প্রশ্নোত্তরে রাজেন বলছে, "মনের মিলনটাকে আমি তুচ্ছ করি না। কিন্তু ওকেই অদ্বিতীয় বলে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করাটাও হয়েছে আজকালকার একটা উচ্চাঙ্গের পদ্ধতি। ... সংসারে যেন শুধু কেবল মনটাই আছে, আর তার বাইরে সব মায়া, সব ছায়াবাজী। এটা ভুল।" দেখুন, যে কমল 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসে তার অকাট্য যুক্তিতে একে একে সবাইকে পরাজিত করল, তাকে রাজেন কেমন জোর চেপে ধরেছে। কমলের বক্তব্য হচ্ছে, যেন মনই একমাত্র সব — অনুষ্ঠান, মত এগুলি কিছুই নয়। সেখানে রাজেন কমলকে বলছে, "আপনি বিভিন্ন মতবাদকে শ্রদ্ধা করতে পারাটাকেই মস্ত বড় শিক্ষা বলছিলেন, কিন্তু সর্বপ্রকার মতকেই শ্রদ্ধা করতে পারে কে জানেন? যার নিজের কোন মতের বালাই নেই। শিক্ষার দ্বারা বিরুদ্ধ মতকে নিঃশব্দে উপেক্ষা করা যায়, কিন্তু শ্রদ্ধা করা যায় না।" অর্থাৎ, সে বলতে চাইছে, শিক্ষার দ্বারা বিরুদ্ধ মতকে সহ্য করা যায়, বরদাস্ত করা যায় — যেটাকে আমরা বলি বিরুদ্ধ মতের প্রতি 'ফিলজফিক্যাল টলারেন্স' (দার্শনিক সহনশীলতা), তাঁর বক্তব্য সেই চিন্তার কত কাছাকাছি! কিন্তু অপরের মতকে শ্রদ্ধা করতে সে-ই পারে, যার নিজের মতের কোনও বালাই নেই।

আবার সে বলছে, মনের মিলটাই সব নয়। বাইরের অনুষ্ঠানটাও অনেকখানি। তাই তার কমলের কাছে

বক্তব্য হ'ল — এই যে শিবনাথ এবং কমলের এতবড় একটা ভালবাসা এত সহজে চলে গেল, তা হয়তো বাইরের অনুষ্ঠানটা মিথ্যা ছিল বলেই। সে কমলকে বলছে, "আপনার নিজের বিবাহের ব্যাপারে মনের মিলটাকেই একমাত্র সত্য স্থির বলে বাহ্যিক অনুষ্ঠানের গরমিলটাকে কিচ্ছু না বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেটা সত্য নয় বলেই আজ আপনাদের সমস্ত অসত্য হয়ে গেল।" অর্থাৎ, সে বলতে চাইছে, এই মিথ্যা থাকার ঘটনাটারও ভালবাসা চলে যাওয়ার পিছনে অবদান আছে। কারণ, তার একটা ভূমিকা আছে। আবার অনুষ্ঠানটি ঠিক মতো হলেও যে ভালোবাসা চলে যেতে পারত না, তা নয়। কিন্তু এই ভালবাসা চলে যাবার পিছনে অনুষ্ঠানটি না হওয়ার একেবারে কোন অবদানই ছিল না — একথাও বলা চলে না। এরপর রাজেন তার মতো যুক্তি করে বলছে যে, "...কি হবে আমার মনের মিল নিয়ে ... আমার চাই মতের ঐক্য, কাজের ঐক্য — ও ভাববিলাসের মূল্য আমাদের কাছে নেই।" এটা হ'ল এক ধরনের যান্ত্রিক বস্তুবাদী চিন্তা।...

...'পথের দাবী'-র সব্যসাচীকেও শরৎচন্দ্র অনেকটা এইভাবেই চিত্রিত করেছেন। ঔদার্যের জিনিস যখন যতটুকু চোখে পড়েছে, তাকেই তিনি মর্যাদা দিয়েছেন। কিন্তু তিনিও মনের অনুভূতি নিয়ে ভাববার তেমন অবসর পাননি, চিন্তাও করেননি। তাই সুমিত্রা তাঁকে একটা ঢাকা দেওয়া 'বয়লারে'র সঙ্গে তুলনা করেছিল — যে ঢাকা দেওয়া বয়লারটা বাইরে থেকে নিরুত্তাপ এবং ঠাণ্ডা মনে হলেও ভেতরে তার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। ভারতীকে নিয়ে সুমিত্রা যখন কারখানা পরিদর্শন করছে, তখন বয়লারের ঢাকনিটা খুলে যাওয়া মাত্রই ভিতরের আগুনটা প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে গম গম করছিল। সেটা দেখবার পর সুমিত্রার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। সে ভারতীকে বলছে, "এই ভয়ানক যন্ত্রটাকে চিনে রাখ ভারতী, তোমাদের ডাক্তারবাবুকে চিনতে পারবে।" মানে সুমিত্রা বলছে যে, ডাক্তারবাবুও ঐরকম একটা যন্ত্র, যার ভিতরে শুধু স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা দাউ দাউ করে জ্বলছে আর সব কিছুই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে — স্নেহ-প্রেম-প্রীতি সমস্ত কিছুই। কিন্তু সব্যসাচীর সমস্ত কিছুই যে ছাই হয়ে যায়নি — তার প্রমাণ অপূর্বর প্রাণদান। তার প্রমাণ ভারতীর সঙ্গে তার অমন স্নেহময় মধুর সম্পর্ক। কিন্তু এ নিয়ে বেশি মাথা ঘামানো বা বিলাস করার অবকাশ তার ছিল না। রাজেনও প্রায় অনুরূপ। শরৎচন্দ্রের এইসব চরিত্রচিত্রণের ক্ষেত্রে যান্ত্রিকতার প্রভাব আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ ঘটনাগুলো দিয়ে আমি দেখাতে চাইছি যে, অতীতের ইউরোপের মানবতাবাদী সাহিত্য, যা ভালবাসার স্বাধীনতা নিয়ে লড়েছে — তাদের যে একদেশদর্শিতা — সেই একদেশদর্শিতা থেকে শরৎচন্দ্র মুক্ত ছিলেন। সেটাও তখনকার সামাজিক পরিস্থিতিতে অনেক বিপ্লবাত্মক ভূমিকা পালন করেছে।

শরৎসাহিত্যে এইসব জিনিসের নিহিত অর্থ কী, তা যাঁরা অনুধাবন করতে সক্ষম হননি, সেইসব বড় কথার, ফাঁকির কারবারি তথাকথিত বিদগ্ধরাই বলে থাকেন — 'উনি জমিদারদের নিয়ে গল্প লিখেছেন', 'উনি পাকশালার সাহিত্যিক', 'শরৎসাহিত্যে আবার উচ্চ রস কী', ইত্যাদি। এই ধরনের সমালোচকরা হলেন সেই ধরনের ইনটেলেকচ্যুয়াল (!) যাঁরা সভা-সমিতিতে বড় বড় কথা বলে এসে পরমুহূর্তেই ভাইকে সর্বস্বান্ত করে বিষয় সম্পত্তি আত্মসাৎ করতে বিন্দুমাত্র লজ্জাবোধ করেন না, বিধবা বোনকে খেতে দেন না এবং নিজের স্ত্রীকে দিয়ে মা'য়ের অসম্মান করে থাকেন।

* * *

... আমাদের দেশে আজ যদি যুগের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে সর্বহারার সংস্কৃতি, সর্বহারার সাহিত্য — যাকে আমরা বলতে পারি, এদেশের রবীন্দ্রোত্তর শরৎ-উত্তর সাহিত্য — তা যদি গড়ে তুলতে হয়, তা তখনই গড়ে তোলা সম্ভব যখন মানবতাবাদী সাহিত্যের ঐ সবচেয়ে বিপ্লবাত্মক ধারাটি যা শরৎসাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে, তাকে আপনারা অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন এবং তাকে সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষিত করে ফেলতে পারবেন। অর্থাৎ তার রস সম্পূর্ণভাবে নিংড়ে নিয়ে তাকে হজম করে তার ছোবড়া ফেলে দিতে পারবেন। তখনই আপনারা আজকের যুগের উন্নততর সর্বহারা সংস্কৃতির জন্ম দিতে পারবেন। কারণ, সর্বহারা সংস্কৃতি মানবতাবাদী সংস্কৃতির থেকে নিম্নস্তরের হলে — অর্থাৎ, রবীন্দ্র-শরৎ সাহিত্যের থেকে নিম্নস্তরের রুচির মানকে প্রদর্শিত করলে তা শুধু চলবে না তা নয়, এ মজুর আন্দোলনেরও কোমর ভেঙে দেবে এবং তা শেষ পর্যন্ত বুর্জোয়াদেরই সুবিধা করে দেবে। বুর্জোয়া সমাজকে শ্রমিক কখনো ভাঙতে পারে না তার থেকে ছোট জিনিস দিয়ে। বুর্জোয়া মানবতাবাদ যা সৃষ্টি করেছে — আদর্শের ক্ষেত্রে, রাজনীতির ক্ষেত্রে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে, সমস্ত দিক থেকে তার চাইতে উন্নততর জিনিস দিয়ে যখন আঘাত করা যাবে —

কেবলমাত্র তখনই শ্রমিক আন্দোলন বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থাকে ভাঙতে পারবে। কাজেই তদানীন্তন সমাজে সবচেয়ে বিপ্লবাত্মক মানবতাবাদী চিন্তা যে সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে এবং চিন্তা, শিল্পগত মান এবং রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে সেই সাহিত্য যে উচ্চমান গড়ে তুলেছে — আজকের দিনের সর্বহারা সংস্কৃতির উত্তরসাধকরা যদি সেই সাহিত্যকে উপযুক্তভাবে অনুধাবন করতে না পারেন, তাহলে সর্বহারাশ্রেণীর সাহিত্যও তাঁরা ফরমূলা মাফিক তৈরি করবেন, তার স্বরূপ তাঁরা ধরতে পারবেন না।

... শরৎ সাহিত্যকে আমরা ঠিকমতো উপলব্ধি করলে আজকের প্রগতিশীল আন্দোলনে নীতি-নৈতিকতার একটা ভিত্তি তৈরি হবে। পরস্পর মতগুলোর সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে সত্যকে পাওয়ার একটা রাস্তা আমরা খুঁজে পাব। শরৎচন্দ্রকে বিস্মৃত হওয়ার ফলেই আজকের দিনের রাজনৈতিক আন্দোলন, গণআন্দোলন, সাহিত্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে নীতি-নৈতিকতা, রুচি-সংস্কৃতির উঁচু মানটা নেমে গিয়েছে। যে উঁচু মানটা একসময় এদেশে গড়েও উঠেছিল, তা ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে। ফলে, আমরা ছিন্নমূল হয়ে গিয়েছি। তাই আমরা বড় কথা বলি, কিন্তু বড় হৃদয়বৃত্তির কারবার করি না। কোন আন্দোলনই তো শুধুমাত্র বুদ্ধির কারবার নয় — বুদ্ধি এবং হৃদয়বৃত্তির কারবার। বিপ্লবটাও তাই। চিন্তা এগিয়ে যাচ্ছে, সেখানে হৃদয়বৃত্তির আধারটা নিচুস্তরে নেমে থাকলে তো ব্যবধান হয়ে যাবে। তাহলে আন্দোলন এবং চিন্তাও শেষ পর্যন্ত বিপথগামী হবে। ফলে, পথ পাওয়া যাবে না। আজকের দিনে ভারতবর্ষের গণআন্দোলনের স্তরে স্তরে যে নীতি-নৈতিকতা নেই — এ সত্য আমি অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করছি। আপনারা জানেন, আমি রাজনীতি করি। আমি একজন বামপন্থী আন্দোলন এবং সাম্যবাদী আন্দোলনের লোক। এঁরা আমাকে কেন সাহিত্য সভায় ডাকেন, তা এঁরাই ভাল জানেন। মাঝে মাঝে টেনে আনেন বলে আসতে হয়। কিন্তু এই আন্দোলনের মধ্যে থেকে একটা কথা আমাকে বারবার ধাক্কা দিচ্ছে। তা হচ্ছে — এর নীতি-নৈতিকতা, সংস্কৃতির সুর এবং আধার ধসে গিয়েছে। তাই আজ শুধু স্লোগানসর্বস্ব আন্দোলন হচ্ছে। ফলে, বারবার গমকে গমকে ফুলে ফুলে আসছে আন্দোলন — 'পরিবর্তন চাই, বিপ্লব চাই' বলে। মানুষ মরছে, যুবকরা মরছে। কিন্তু বিপ্লব হচ্ছে না, পরিবর্তন আসছে না। এইরকম বিচ্ছিন্ন একান্তভাবে রুচি-সংস্কৃতি বহির্ভূত আন্দোলনে শুধু লড়াই করলে, প্রাণ দিলে তার দ্বারা পরিবর্তন আসে না। সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্যের ভিত্তিতে নীতিভিত্তিক আন্দোলন হলে তবেই জাতির মেরুদণ্ড খাড়া হবে।...

... শরৎ সংস্কৃতির চর্চা, শরৎচন্দ্রের চিন্তাভাবনা নিয়ে আলাপ-আলোচনা আজকের সমাজে এইজন্যেই আরও বেশি দরকার যে, আমরা ছিন্নমূল হয়ে পড়েছি। সংস্কৃতির যে উচ্চ আধারটা স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় তৈরি হয়েছিল, আমরা তার ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারছি না। বড় কথাগুলো আমরা বিশ্বের থেকে আহরণ করেছি, কিন্তু দেশের মাটিতে গড়ে ওঠা উচ্চ সংস্কৃতির সুরের সঙ্গে আমরা যেন যোগসূত্র হারিয়ে ফেলেছি। সেই যোগসূত্রটি গড়ে তুলতে হবে। অথচ, তার সঙ্গে আজ বিরোধও অবশ্যম্ভাবী। কারণ, তিনি ছিলেন পেটিবুর্জোয়া বিপ্লববাদ এবং মানবতাবাদের উপাসক। আর, আমাদের করতে হবে শ্রমিক বিপ্লব, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব — পুঁজিবাদ উচ্ছেদের বিপ্লব। কাজেই বিপ্লবের সাধনায় আমাদের আর এক ধাপ এগিয়ে যেতে হবে। কিন্তু আমরা এগিয়ে যেতে তখনই পারব, যখন আমরা শরৎচন্দ্রকে বুঝেছি এবং বুঝে তার সমস্ত রসটুকু নিংড়ে নিয়ে তার ছিবড়েটা ফেলে দিয়েছি, তার অকার্যকরী দিকটা ফেলে দিয়েছি, তার মধ্যে যা কিছু সম্পদ ছিল — সমস্ত সম্পদগুলো নিয়ে আমরা নিঃশেষিত করে ফেলেছি। আর আমাদের নেওয়ার কিছু নেই। কিন্তু আমরা নিতেই পারলাম না কিছু। আমরা যোগসূত্রই হারিয়ে ফেললাম। শরৎচন্দ্রের স্তরের উন্নত মানসিকতা এবং মূল্যবোধগুলিই আমাদের মধ্যে নেই। তাহলে আমরা আজকের দিনের বিপ্লবের সৈনিক হব কী করে? সমাজকে পাল্টাবো কী করে? তাই শরৎচন্দ্রকে ভালভাবে জানতে হবে, বুঝতে হবে।...

প্রথম প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭